يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى
اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾ هُوَ
الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ
عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ
اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ
وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا
فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۗ
هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾
اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ
كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ
اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا
فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا
يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾

(৩২) তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন—যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। (৩৩) তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। (৩৪) হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহ্‌র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। (৩৫) সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে) ,এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার। (৩৬) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ্ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদী-খ্রীষ্টানদের এহেন বাতিল পথের অনুসরণ এবং গায়রুল্লাহ্‌র অবৈধ আনুগত্যের বিবরণ দিয়ে এ আয়াতটি শেষ করা হয়। পরবর্তী আয়াতে বলা হয় যে, তারা গোমরাহী করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং আল্লাহ্‌র সত্য দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করারও ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। আয়াতে উপমা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এরা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ এটি তাদের জন্যে অসম্ভব। বরং আল্লাহ্‌র অমোঘ ফয়সালা যে, তিনি নিজের নূর তথা দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, তা কাফের ও মুশরিকদের যতই মর্মপীড়ার কারণ হোক না কেন?

এরপর ৩৩ নং আয়াতের সারকথাও এটাই যে, আল্লাহ্ আপন রসূলকে হেদায়েতের উপকরণ কোরআন এবং সত্য দ্বীন-ইসলাম সহকারে এজন্যে প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় সূচিত হয়। এ মর্মে আরও কতিপয় আয়াত কোরআনে রয়েছে, যাতে সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে যে, অন্যান্য দ্বীনের উপর দ্বীনে-ইসলামের বিজয় লাভের সুসংবাদগুলো অধিকাংশ অবস্থা ও কালানুপাতিক যেমন, হযরত মিক্‌দাদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ "এমন কোন কাঁচা ও পাকা ঘর দুনিয়ার বুকে থাকবে না, যেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটবে না। সম্মানীদের সম্মানের সাথে এবং লাঞ্ছিতদের লাঞ্ছনার সাথে, আল্লাহ্ যাদের সম্মানিত করবেন তারা ইসলাম কবুল করবে এবং যাদের লাঞ্ছিত করবেন তারা ইসলাম গ্রহণে বিমুখ থাকবে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজায় পরিণত হবে।" আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হয়। যার ফলে গোটা দুনিয়ার উপর প্রায় এক হাজার বছর যাবত ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তৃত থাকে।

চতুর্থ আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করে ইহুদী-খ্রীষ্টান পীর-পুরোহিতদের এমন কুকীর্তির বর্ণনা দেয়া হয়, যা লোকসমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইহুদী-খ্রীষ্টানের আলোচনায় মুসলমানদের হয়তো এ উদ্দেশে সম্বোধন করা হয় যে, তাদের অবস্থাও যেন ওদের মত না হয়। আয়াতে ইহুদী খ্রীষ্টান পীর-পুরোহিতগণের অধিকাংশ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামাল গলাধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহ্‌র সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত রাখছে।

অধিকাংশ পীর-পুরোহিতগণের যেখানে এ অবস্থা, সেখানে সাধারণভাবে সমকালীন সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু কোরআন মজীদ তা না করে كثيرا (অধিকাংশ) শব্দ প্রয়োগ করেছে। এর দ্বারা মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, তারা যেন শত্রুর বেলায়ও কোনরূপ বাড়াবাড়ির আশ্রয় না নেয়।

গর্হিত পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগের অর্থ হল, অনেক সময় তারা পয়সা নিয়ে তওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তওরাতের বিধি-নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা-বাহানা সৃষ্টি করে জ্ঞানপাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। তাদের বড় অপরাধ হল যে, তারা নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট নয়, বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়াতো। কেননা, যেখানে নেতাদের এ অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকী থাকে না।

ছাড়া, পীর-পুরোহিতগণের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ তাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস করে নেয়।

ইহুদী-খ্রীষ্টান আলেম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্টি হয় তাদের লোভ-লালসা থেকে। এজন্যে আয়াতে বর্ণিত অর্থলিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজা এবং এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণিত হয়। এরশাদ হয়েছে ঃ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ "অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে, তা খরচ করে না আল্লাহ্র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন।"

"আর তা খরচ করে না আল্লাহ্র পথে" বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা বিধানমতে আল্লাহ্র ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে তাদের অবশিষ্ট অর্থ সম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ "যে মালামালের যাকাত দেয়া হয়, তা জমা করা সঞ্চিত ধন-রত্নের শামিল নয়।" -(আবু দাউদ, আহমদ)। এ থেকে বুঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা গোনাহ নয়। অধিকাংশ ফকীহ ও ঈমামগণ এমতের অনুসারী।

وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا "আর তা খরচ করে না" বাক্যের 'তা' সর্বনামের উদ্দিষ্ট বস্তু হল রৌপ্য। অথচ, আয়াতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে। তফসীরে মাযহারীর মতে এ বর্ণনাভঙ্গিতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যার অল্প পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে, সে যাকাত প্রদানের বেলায় স্বর্ণকে রূপার মূল্যের সাথে যোগ করে রূপার হিসাবমতে যাকাত প্রদান করবে।

শেষের আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ংকৃত আমলই সে আমলের সাজা।

অর্থাৎ, যে অর্থ সম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তার যাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য আযাবের রূপধারণ করে।

এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থ সমগ্র শরীরও হতে পারে। কিংবা এই তিন অঙ্গের উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, যে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোন ভিক্ষুক কিছু চায়, কিংবা যাকাত তলব করে, তখন সে প্রথমে ভ্রূকুঞ্চন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্যে বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আযাব দানের উল্লেখ করা হয়।

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا "নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট মাস-গণনায় মাস হল বারটি।" এখানে উল্লেখিত عدت অর্থ গণনা। شهور হল شهر -এর বহুবচন। অর্থাৎ, মাস। বাক্যের সারমর্ম হল, আল্লাহ্র কাছে মাসের সংখ্যা বারটি নির্ধারিত; এতে কম বেশী করার কারো ক্ষমতা নেই।

অতঃপর فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ বলে স্পষ্ট করা হয় যে, বিষয়টি রোজে আযল অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রথম দিনেই লওহে-মাহফুযে লিখিত রয়েছে। এরপর يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ বলে ইঙ্গিত করা হয় যে, রোজে আযলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও মাসগুলোরও ধারাবাহিকতা নির্ধারিত হয়। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি পরবর্তী মুহূর্তে।

তারপর বলা হয়- مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ অর্থাৎ, তন্মধ্যে চার মাস হল নিষিদ্ধ। সেহেতু এ চার মাস যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত হারাম। অর্থ হল, এই চারটি মাস সম্মানী, যেহেতু মাসগুলো অতীব বরকতময়। এতে এবাদতের সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রথম অর্থ মতে যে হুকুম, তা ইসলামী শরীয়তে রহিত। তবে দ্বিতীয় অর্থ মতে আদব ও সম্মান প্রদর্শন এবং এবাদতে যত্নবান হওয়ার হুকুমটি ইসলামেও বাকী রয়েছে।

বিদায় হজ্জের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খোতবায় নবী করীম (সাঃ) সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন, 'তিনটি মাস হল ধারাবাহিক— যিলকদ, যিলহজ্জ ও মহররম, অপরটি হল রজব। তবে রজব সম্পর্কে আরববাসীদের দ্বিমত রয়েছে। কতিপয় গোত্রের মতে রজব হল রমযান। আর মুযার গোত্রের ধারণামতে রজব হল জমাদিউস-সানী ও শা'বানের মধ্যবর্তী মাসটি। তাই নবী করীম (সাঃ) খোতবায় মুযার গোত্রের রজব বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন।

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ "এটিই হল সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" অর্থাৎ, মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ ও সম্মানিত মাসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হুকুম-আহ্কামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের এলাহী নিয়মের সাথে সঙ্গতিশীল রাখাই হল দ্বীনে-মুসতাকীম। এতে কোন মানুষের কম-বেশী কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার প্রয়াস অসুস্থ বিবেক ও মন্দ স্বভাবের আলামত।

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ "সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোতে নিজেদের প্রতি অবিচার করো না" অর্থাৎ, এ পবিত্র মাসগুলোর যথাযথ আদব রক্ষা না করে এবং এবাদত বন্দেগীতে অলস থেকে নিজেদের ক্ষতি করো না।

ইমাম জাস্সাস (রহঃ) 'আহ্কামুল - কোরআন' গ্রন্থে বলেন, কোরআনের এ বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ মাসগুলোর এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে এতে এবাদত করা হলে বাকী মাসগুলোতেও এবাদতের তওফীক ও সাহস লাভ করা যায়। অনুরূপ কেউ এ মাসগুলোতে পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলে বছরের বাকী মাসগুলোতেও পাপাচার থেকে দূরে থাকা সহজ হয়। তাই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হবে অপূরণীয় ক্ষতি।

إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ
اللّٰهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا مَا لَكُمْ
إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ
أَرَضِيتُم بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
فِي الْاٰخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ
وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ
عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا
السُّفْلٰى ۗ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾
انفِرُوا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

(৩৭) এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ মাসগুলোর। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহ্‌র হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হল। আর আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (৩৮) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহ্‌র পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। (৩৯) যদি বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (৪০) যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ্ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহ্‌র কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪১) তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আহকাম ও মাসায়েল

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাসের যে ধারাবাহিকতা এবং মাসগুলোর যে নাম ইসলামী শরীয়তে প্রচলিত, তা মানবরচিত পরিভাষা নয়; বরং রাব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই মাসের তরতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহ্‌কাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শরীয়তের আহ্‌কামের ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসই নির্ভরযোগ্য। চান্দ্রমাসের হিসাবমতেই রোযা, হজ্ব ও যাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। তবে কোরআন মজীদ চন্দ্রকে যেমন, তেমনি সূর্যকেও সন-তারিখ ঠিক করার মানদন্ডরূপে অভিহিত করেছেন— لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ কর)। অতএব, চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমেই সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েয। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহ্‌র অধিকতর পছন্দ। তাই শরীয়তের আহকামকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্যে চান্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরযে-কেফায়া; সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই গোনাহ্‌গার হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রের হিসাব ব্যবহার করা জায়েয আছে। তবে তা আল্লাহ্‌র রাসূল ও পরবর্তীগণের তরীকার বরখেলাফ। সুতরাং অনাবশ্যকভাবে অন্য হিসাব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।

মাসের হিসাব পূর্ণ করার উদ্দেশে মূল মাস বাড়ানোর যে প্রথা আছে, এই আয়াতের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তাকেও না-জায়েয মনে করেন। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। কেননা, এতে শরীয়তের বিধানের কোন সম্পর্ক নেই। জাহেলী যুগে চান্দ্রমাস পরিবর্তনের ফলে শরীয়তের হুকুম পরিবর্তিত হতো বিধায় তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা যেহেতু পরিবর্তন হয় না, তাই তা উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

দুনিয়ার মোহ ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূল ঃ অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা' এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, দ্বীনের ব্যাপারে সকল আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গোনাহের মূলে রয়েছে দুনিয়া প্রীতি ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। হাদীস শরীফে আছে – حب الدنيا رأس كل خطيئة অর্থাৎ, দুনিয়ার মোহ সকল গোনাহের মূল। সেজন্য আয়াতে বলা হয় ঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, আল্লাহ্‌র পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর (চলাফেরা করতে চাও না)। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে।"

রোগ নির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিকার উল্লেখ করা হয়েছে যে, "পার্থিব জিন্দেগীর ভোগের উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।"

সারকথা হল, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা-ভাবনাই মানুষের করা উচিত। বস্তুতঃ আখেরাতের চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়।

ইসলামী আকাদীর মৌলিক বিষয় তিনটি ঃ তওহীদ, রেসালত ও পরকালের বিশ্বাস। তন্মধ্যে পরকালের বিশ্বাস হল বিশুদ্ধ আমলের মূল

এবং গোনাহ্ ও অপরাধের ক্ষেত্রে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। চিন্তা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দুনিয়ার শান্তি-শৃংখলা আখেরাতের আকীদা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুবাদী উন্নতির এখন যৌবনকাল। অপরাধ দমনে সকল জাতি ও দেশের চেষ্টা-তদবীরের অন্ত নেই। আইন-আদালত ও অপরাধ দমনকারী সংস্থাসমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনা সবই আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দৈনন্দিন বেড়েই চলছে। আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক রোগ নির্ণয় ও তার সঠিক প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বলেই আজকের এ অস্থিরতা। বস্তুতঃ এ সকল রোগের মূলে রয়েছে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, পার্থিব ব্যস্ততা এবং আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। আমাদের বিশ্বাস, এর একমাত্র প্রতিকার হল, আল্লাহ্র যিকর ও স্মরণ এবং আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা। যে দেশে যখন এই অমোঘ প্রতিকার প্রয়োগ করা হয়, সে দেশ ও সমাজ মানবতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ফেরেশতাগণেরও ঈর্ষার পাত্র হয়েছিল। নবী ও সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণ-যুগ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আজকের বিশ্ব অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ চায়, কিন্তু আল্লাহ্ ও আখেরাত থেকে উদাসীন হয়ে পদে পদে এমন ব্যবস্থাও করে রাখছে, যার ফলে আল্লাহ্র ও আখেরাতের প্রতি মনোযোগ আসে না। তাই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, অপরাধ দমনের সকল উন্নত ব্যবস্থাপনাই ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। অপরাধ দমন তো দূরের কথা, ঝড়ের বেগে যেন তা' বৃদ্ধি পাচ্ছে। হায় ! আজকের চিন্তাশীল মহল যদি উপরোক্ত কোরআনী প্রতিকার প্রয়োগ করে দেখত, তবে বুঝতে পারত, কত সহজে অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ সাধন করা যায়।

৩৯ নং আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেয়া হয় যে, ''তোমরা জেহাদে বের না হলে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দ্বীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৪০ নং আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহ্র রসূল কোন মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মোহতাজ নন। আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে গায়ব থেকে তাঁর সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন, হিজরতের সময় করা হয়, যখন তাঁর আপন গোত্র ও দেশবাসী তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সফরসঙ্গী হিসেবে একমাত্র সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ছাড়া আর কেউ ছিল না। পদব্রজী ও অশ্বারোহী শত্রুরা সর্বত্র তাঁর খোঁজ করে ফিরছে। অথচ আশ্রয়স্থল কোন মজবুত দুর্গ ছিল না; বরং তা ছিল এক গিরিগুহা, যার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিল তাঁর শত্রুরা। তখন গুহা-সঙ্গী আবু বকর (রাঃ)-এর চিন্তা নিজের জন্য ছিল না, বরং তিনি এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যে, হয়তো শত্রুরা তাঁর বন্ধুর জীবন নাশ করে দেবে, কিন্তু এ সময়েও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ছিলেন পাহাড়ের মত অনড়, অটল ও নিশ্চিন্ত। শুধু যে নিজে, তা নয়, বরং সফরসঙ্গীকেও অভয় দিয়ে বলছিলেন, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।'' দু'শব্দের এ বাক্যটি বলা মুশকিল কিছু নয়। কিন্তু শ্রোতাবৃন্দ এ নাজুক দৃশ্য সামনে রেখে চিন্তা করলে বুঝতে দেরী হবে না যে, নিছক দুনিয়াবী উপায়-উপকরণের প্রতি ভরসা রেখে মনের এই নিশ্চিন্তভাব সম্ভব নয়। তবুও যে সম্ভব হল, আয়াতের পরবর্তী বাক্যে তার রহস্য বলে দেয়া হল। এরশাদ হয় ঃ 'আল্লাহ্ তাঁর কলব মোবারকে সান্ত্বনা নাযিল করেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তাঁর সাহায্য করেন, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।'' অদৃশ্য বাহিনী বলতে ফেরেশতাগণও হতে পারেন এবং জগতের গোপন শক্তিসমূহও হতে পারে। কারণ, এগুলোও আল্লাহ্র সৈন্যদল। সার কথা, এর ফলে কুফরীর পতাকা অবনমিত হয় এবং আল্লাহ্র ঝাণ্ডা মাথা তুলে দাঁড়ায়।

৪১ নং আয়াতে তাগিদদানের উদ্দেশে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, জেহাদে বের হবার জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন তোমাদের আদেশ করেন, তখন সর্বাবস্থায় তা তোমাদের জন্যে ফরয হয়ে গেল। আর এ আদেশ পালনের মাঝেই নিহিত রয়েছে তোমাদের সমুদয় কল্যাণ।

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ
وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ
لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿٤٢﴾ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ
أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ
الْكٰذِبِينَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ
فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ
لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ
فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقٰعِدِينَ ﴿٤٦﴾
لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا
وَّلَأَوْضَعُوا خِلٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ
وَفِيكُمْ سَمّٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظّٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾

(৪২) যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী। (৪৩) আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের। (৪৪) আল্লাহ্ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ্ সাবধানীদের ভাল জানেন। (৪৫) নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ্ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলছে। (৪৬) আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক। (৪৭) যদি তোমাদের সাথে তারা বের হত, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালিমদের ভালভাবেই জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৪২ নং আয়াতে অলসতার দরুন জেহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন লোকদের একটি ওযরকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয় যে, এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ্ যে শক্তি-সামর্থ্য তাদের দান করেছেন, তা, আল্লাহ্‌র রাহে সাধ্যমত ব্যয় করেনি। তাই তাদের অসমর্থ থাকার ওযর গ্রহণযোগ্য নয়।

গ্রহণযোগ্য ওযর ও বাহানার পার্থক্য : এ আয়াত থেকে একটি মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রকৃত ওযর ও বাহানার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। তাহল, সেই লোকদের ওযর প্রকৃত গ্রহণযোগ্য, যারা আদেশ পালনে প্রস্তুত, কিন্তু কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে পরে অসমর্থ হয়ে পড়ে। মাযুরগণের সকল বিষয় এ নিরিখে যাচাই করা যাবে, কিন্তু আদেশ পালনে যার কোন কোন ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নেই, পরে তার যদি কোন ওযরও উপস্থিত হয়, তবে গোনাহের এ ওযর হবে গোনাহের চাইতে নিকৃষ্ট। সুতরাং এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ জুমআ'র নামাযে শরীক হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র চলার ইচ্ছা করল, হঠাৎ এক ঘটনায় তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। এ ধরনের ওযর গ্রহণযোগ্য এবং এতে আল্লাহ্ মা'যুর লোকের পূর্ণ সাওয়াব দান করেন। কিন্তু যে জুমআ'র কোন প্রস্তুতিই নেয়নি, তার কোন ওযর উপস্থিত হলে তা'হবে বাহানার নামান্তর।

উদাহরণতঃ দেখা যায়, ভোরে ফজরের জামাআতে শরীক হওয়ার প্রস্তুতিস্বরূপ ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখে, কিংবা সময়মত জাগাবার জন্য কাউকে নিয়োজিত রাখে, কিন্তু পরে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। ফলে নামায কাযা হয়ে যায়। যেমন, রসূলে করীম (সাঃ)-এর লায়লাতুত্ তা'রীসের ঘটনা। সময়মত জেগে উঠার জন্যে তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)-কে নিয়োজিত রাখেন যেন প্রত্যূষে সবাইকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকেও তন্দ্রায় পেয়ে বসে। ফলে সূর্যোদয়ের পর সকলের চোখ খোলে। এ ওযর প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য। যে কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবা কেরামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, لاتفريط فى النوم انما التفريط فى اليقظة অর্থাৎ, "ঘুমের মধ্যে মানুষ মা'যুর। তাই এটি হল যা মানুষ জাগ্রত অবস্থায় করে।" সান্ত্বনার কারণ হল, সময়মত জেগে উঠার সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। সারকথা এই যে, আদেশ পালনের প্রস্তুতিও ও অপ্রস্তুতির মাধ্যমে কোন ওযর গ্রহণযোগ্য কিনা তা জানা যাবে। নিছক মৌখিক জমা-খরচ দিয়ে কিছু লাভ হবে না।

৪২ নং আয়াতে মিথ্যা ওযর দেখিয়ে অব্যাহতি লাভকারী মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, জেহাদ থেকে নিবৃত্ত থাকাই উত্তম। কারণ, ওখানে গেলে নানা ষড়যন্ত্র ও গুজবের মাধ্যমে সর্বত্র ফ্যাসাদ সৃষ্টি করত। অতঃপর বলা হয় وَفِيكُمْ سَمّٰعُونَ لَهُمْ অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে আছে এমন এক সরল প্রাণ মুসলমান যারা তাদের মিথ্যা গুজবে বিভ্রান্ত হত।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ
حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي
الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾
اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ
يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ
فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ
مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾ قُلْ
هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ
نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ
اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾ قُلْ
اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا
فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ
اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ
اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾

(৪৮) তারা পূর্বে থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ উলট-পালট করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং জয়ী হল আল্লাহ্‌র হুকুম, যে অবস্থায় তারা মন্দবোধ করল। (৪৯) আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শোনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। (৫০) আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা মন্দবোধ করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে। (৫১) আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য রেখেছেন; তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহ্‌র উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। (৫২) আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ্ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ। (৫৩) 'আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা' কখনো কবুল হবে না, তোমরা নাফরমানের দল। (৫৪) তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ, "ইতিপূর্বেও তারা ফাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল।" যেমন, ওহুদ যুদ্ধ প্রভৃতিতে। وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌র বিজয় হল, যাতে মুনাফিকরা মর্মপীড়া বোধ করছিল।" এর দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, জয়-বিজয় সবই আল্লাহ্‌র আয়ত্তে। যেমন ইতিপূর্বের যুদ্ধসমূহে আপনাকে জয়ী করা হয়েছে, তেমনি এ যুদ্ধেও জয়ী হবেন এবং মুনাফিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে পড়বে।

ষষ্ঠ আয়াতে জদ বিন কায়স নামক জনৈক বিশিষ্ট মুনাফিকের এক বিশেষ বাহানার উল্লেখ করে তার গোমরাহীর বর্ণনা দেয়া হয়। সে জেহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে ওযর পেশ করে বলেছিল, আমি এক পৌরুষদীপ্ত যুবক। রোমানদের সাথে যুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাদের সুন্দরী যুবতীদের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। কোরআন মজীদ তার কথার উত্তরে বলে ঃ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا "ভাল করে শোন" এই নির্বোধ এক সম্ভাব্য আশংকার বাহানা করে এক নিশ্চিত আশংকা অর্থাৎ, রসূলের অবাধ্যতা ও জেহাদ পরিত্যাগের অপরাধের এখনই দণ্ডযোগ্য হয়ে গেল। وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ "আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছে"। তা থেকে নিস্তার লাভের উপায় নেই। এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, আখেরাতে জাহান্নাম এদের ঘিরে রাখবে। দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে যে, জাহান্নামে পৌঁছার যে সকল কারণ এদেরকে বর্তমানে ঘিরে রেখেছে, সেগুলোই এখানে জাহান্নাম নামে অভিহিত। এ অর্থ হতে বলা যায়, এরা বর্তমানেও জাহান্নামের গণ্ডির মধ্যে রয়েছে।

সপ্তম আয়াতে এদের এক হীন স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে বলা হয় যে, এরা যদিও বাহ্যতঃ মুসলমানদের সাথে উঠাবসা রাখে, কিন্তু اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ "আপনার কোন মঙ্গল দেখলে তাদের মুখ কাল হয়ে যায়" وان تصبك مصيبة فرحوا এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে উল্লাস করে বলে যে, আমরা আগেভাগেই তা জানতাম যে, মুসলমানরা বিপদগ্রস্ত হবেই, তাই আমাদের জন্যে যা কল্যাণকর, তাই অবলম্বন করেছি।

অষ্টম আয়াতে আল্লাহ্ পাক মহানবী (সাঃ) ও মুসলমানদেরকে মুনাফিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আসল সত্যকে সদা সামনে রাখার হেদায়েত দান করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰىنَا "আপনি ঐ বস্তু পূজারীদের বলে দিন যে, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ। এসব পার্থিব উপকরণ হল এক যবনিকাবিশেষ। এই যবনিকার অন্তরালে যে শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তা আল্লাহ্‌রই। আমরা যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হই তা' আগেই আল্লাহ্ আমাদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। তাই মুসলমানদের আবশ্যক তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখা এবং পার্থিব উপায়-উপকরণকে নিছক মাধ্যম মনে করা, আর মনে করা যে, এগুলোর উপর ভাল-মন্দ নির্ভরশীল নয়।

তদবীর সহকারে তকদীরে বিশ্বাস করা কর্তব্য ঃ বিনা তদবীরে তাওয়াক্কুল করা ভুলঃ আলোচ্য আয়াতটি তকদীর ও তাওয়াক্কুলের

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم
بِهَا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٥٥﴾
وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ
يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَٰرَٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا
لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ
فِي الصَّدَقَٰتِ ۖ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا
مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَآ ءَاتَىٰهُمُ اللَّهُ
وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَ
رَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى اللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ
وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ
النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

(৫৫) সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণবিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়। (৫৬) তারা আল্লাহ্‌র নামে হলফ করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। (৫৭) তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা বা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলে সেদিকে পলায়ন করবে দ্রুতগতিতে। (৫৮) তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সদকা বন্টনে আপনাকে দোষারূপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। (৫৯) কতই না ভাল হত, যদি তারা সন্তুষ্ট হত আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর এবং বলত, আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, আল্লাহ্ আমাদের দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রসূলও, আমরা শুধু আল্লাহ্‌কেই কামনা করি। (৬০) "যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহ্‌র পথে জেহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে- এই হল আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ নবীকে ক্লেশ দেয়, এবং বলে, এ লোকটি তো কানসর্বস্ব। আপনি বলে দিন, কান হলেও তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য, আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাস রাখে মুসলমানদের কথার উপর। বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্য তিনি রহমতবিশেষ। আর যারা আল্লাহ্‌র রসূলের প্রতি কুৎসা রটনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

মূল-তত্ত্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তকদীর ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা) এর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, মানুষ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে এবং বলবে যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। বরং তার অর্থ হল, সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের পর সাধ্যমত চেষ্টা ও সাহস করে যাবে। এরপর বিষয়টিকে তকদীর ও তাওয়াক্কুলের উপর অর্পণ করবে; আর দৃষ্টি আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ রাখবে। কারণ, চেষ্টা ও তদবীরের ফলাফল দানের মালিক হলেন তিনি।

তকদীর ও তাওয়াক্কুলের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি বিদ্যমান। ধর্ম বিরোধী কিছু লোক আদতেই তকদীর ও তাওয়াক্কুলে বিশ্বাসী নয়। তারা পার্থিব উপায়-উপকরণকেই আল্লাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছে। অপর দিকে কিছু মূর্খ লোক আছে, যারা নিজেদের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা ঢাকা দেয়ার জন্য তকদীর ও তাওয়াক্কুলের আশ্রয় নেয়। জেহাদের জন্য নবী করীম (সাঃ)-এর প্রস্তুতি, অতঃপর অত্র আয়াতের অবতরণ এ সকল বাড়াবাড়ির নিরসন করে সত্য পথ কি,তা' দেখিয়ে দিয়েছে। ফার্সী প্রবাদ আছে, তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে উটের পা
বেঁধে নাও।' অর্থাৎ, দুনিয়ার উপায়-উপকরণও আল্লাহ্‌র নেয়ামত, এ নেয়ামতের সদ্ব্যবহার না করা হল না-শোকরী ও মূর্খতা। তবে উপায়-উপকরণকে ঠিক তাই মনে কর, ফলাফল তার অধীন নয়; বরং আল্লাহ্‌র হুকুমের অধীন, সে বিশ্বাস রাখবে।

শেষের আয়াতে মু'মিনদের এক বিরল শানের উল্লেখ করে তাদের বিপদে আনন্দ উপভোগকারী কাফেরদের বলা হয় যে, আমাদের যে বিপদ দেখে তোমরা এত উৎফুল্ল, তাকে আমরা বিপদই মনে করি না; বরং তা আমাদের জন্যে শান্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, মু'মিন আপন চেষ্টায় বিফল হলেও স্থায়ী সওয়াব ও প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়, আর এটিই সকল সফলতার মূলকথা। তাই তারা অকৃতকার্য হলেও কৃতকার্য। তার ভাঙ্গনে রয়েছে গড়ার প্রতিশ্রুতি। এই হল قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ 'তোমরা কি আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষায় আছ?'

অপরদিকে কাফেরদের অবস্থা হল তার বিপরীত। আযাব থেকে কোন অবস্থায়ই তাদের অব্যাহতি নেই। এ জীবনেই তারা মুসলমানগণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আযাব ভোগ করবে এবং এভাবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা পোহাবে। আর যদি এ দুনিয়ায় কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পেয়েও যায়, তবে আখেরাতের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই; তা অবশ্যই ভোগ করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হল, এগুলোর দ্বারা তাদের আযাবে রাখা) বাক্যে মুনাফিকদের জন্যে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে যে আযাব বলে অভিহিত করা হয়েছে, তার কারণ হল, দুনিয়ার মোহে উন্মত্ত থাকা মানুষের জন্যে পার্থিব জীবনেও এক বড় আযাব। প্রথমে অর্থ উপার্জনের সুতীব্র কামনা, অতঃপর তা হাসিলের জন্যে নানা চেষ্টা-তদবীর, নিরন্তর দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, না দিনের আরাম, না রাতের ঘুম, না স্বাস্থ্যের হেফাযত আর না পরিবার-পরিজনের সাথে আমোদ-আহলাদের অবকাশ। অতঃপর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দ্বারা যা কিছু অর্জিত হয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বৃদ্ধি করার অবিশ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি হল একেকটি স্বতন্ত্র আযাব। এরপর যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা রোগ-ব্যাধির কবলে পতিত হয়, তখন যেন আকাশ

পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সবই যদি ঠিক থাকে এবং মনের চাহিদামত কড়ি আসতে থাকে, তখন তার নিরাপত্তার প্রয়োজনও উত্তরোত্তর পায় এবং তখন সে চিন্তা-ফিকির তাকে মুহূর্তের জন্যও আরামে বসতে দেয় না।

পরিশেষে এ সকল অর্থ-সম্পদ যখন মৃত্যুকালে বা তার আগে ছেড়ে-ছাড়া হতে দেখে, তখন দুঃখ ও অনুশোচনার অন্ত থাকে না। বস্তুতঃ এরই হল আযাব। অজ্ঞ মানুষ একে শান্তি ও আরামের সম্বল মনে করে। কিন্তু মনের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি কিসে, তার সন্ধান নেয় না। তাই শান্তির এ উপকরণকেই প্রকৃত শান্তি মনে করে তা' নিয়েই দিবা-নিশি ব্যস্ত থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়ার জীবনে তার আরামের শত্রু এবং পরেরাতের আযাবের পটভূমি।

কাফেরদের সদকা দেয়া যায় কি? শেষের আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুনাফিকরাও সদ্কার অংশ পেত। কিন্তু তাদের মনমত না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে নানা আপত্তি উত্থাপন করত। এখানে যদি সদকার সাধারণ অর্থ নেয়া যায়, যে অর্থ অনুযায়ী সকল ওয়াজিব ও নফল সদ্কা বুঝায়, তবে কোন প্রশ্ন থাকে না। কারণ, অমুসলিমদের নফল সদ্কা দান ইমামগণের ঐকমত্যে জায়েয এবং তা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। আর যদি সদ্কা বলতে ফরয সদকা যথা, যাকাত ও ওশর প্রভৃতি বোঝানো হয়, তবে তা থেকে মুনাফিকদেরকেও এজন্যে দেয়া হত যে, তারা নিজেদেরকে মুসলমানরূপেই প্রকাশ করত এবং কুফরীর কোন প্রকাশ্য প্রমাণও তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। আল্লাহ্ বিশেষ কোন উদ্দেশে দান করেন যে, তাদের সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা হোক।—(বয়ানুল কোরআন)

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى "তারা নামাযে আসে না, কিন্তু আলস্যভরে"— আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি আলামত বর্ণিত হয়েছে। নামাযে আলস্য ও দান-খয়রাতে কুণ্ঠাবোধ। এতে মুসলমানদের প্রতি হুঁশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা মুনাফিকদের এই দু'প্রকার অভ্যাস থেকে দূরে থাকে।

সদ্কার ব্যয় খাতঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে সদ্কা সম্পর্কে মহানবী (সাঃ)-এর উপর মুনাফিকদের আপত্তির বর্ণনা ও তার জবাব দেয়া হয়েছে। মুনাফিকরা অপবাদ রটাত যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) (নাউযু-বিল্লাহ্) সদ্কা বন্টনে স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং যাকে যা ইচ্ছা দিয়ে চলেছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক সদ্কার ব্যয়-খাত ঠিক করে দিয়ে তাদের সন্দেহ নিরসন করেছেন এবং কারা সদ্কা পাওয়ার উপযুক্ত তা বাতলে দিয়েছেন। আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্র হুকুমতেই সদ্কার বিলি-বন্টন করছেন; নিজের খেয়াল-খুশীমত নয়।

হাদীস গ্রন্থ আবু দাউদ ও দারে কুত্নী গ্রন্থে বর্ণিত এবং হযরত যেয়াদ বিন হারেস ছদরী কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত এক হাদীস দ্বারাও এ সত্যটি প্রমাণিত হয়। রেওয়ায়েতকারী বলেন, আমি একদা রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি তাঁর গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে সৈন্যের একটি দল অচিরে প্রেরণ করবেন। আমি আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি বিরত হোন, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তারা সবাই আপনার বশ্যতা স্বীকার করে এখানে হাযির হবে। অতঃপর আমি স্বগোত্রের কাছে পত্র প্রেরণ করি। পত্র পেয়ে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে হযরত (সাঃ) আমাকে বলেন, يا اخا صداء المطاع فى قومه অর্থাৎ, 'তুমি তোমার গোত্রের একান্ত প্রিয় নেতা।' আমি আরয করলাম, এতে আমার কৃতিত্বের কিছুই নেই। আল্লাহ্র অনুগ্রহে তারা হেদায়েত লাভ করে মুসলমান হয়েছে। রেওয়ায়েতকারী বলেন, আমি এই বৈঠকে থাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি এসে হযরত (সাঃ)-এর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। হুযুর (সাঃ) তাকে জবাব দিলেন : 'সদ্কার ভাগ-বাটোয়ারার দায়িত্ব আল্লাহ্ নবী বা অন্য কাউকে দেননি। বরং তিনি নিজেই সদ্কার আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই আট শ্রেণীর কোন একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে পারি।— (কুরতুবী-পৃষ্ঠা ১৬৮, খণ্ড-১)

وَفِىٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ অর্থাৎ, ধনীদের সম্পদে রয়েছে ফকীর-বঞ্চিতদের অধিকার (সূরা যারিয়াত) এতে বলা হয়েছে যে, ধনীদের সম্পদে গরীবদের একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে; আর এ হল তাদের হক।

এ থেকে বোঝা যায় যে, ধনীরা যে দান-খয়রাত করে, তা তাদের এহ্সান নয়, বরং এটি গরীবদের হক, যা আদায় করা তাদের কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এ হক আল্লাহ্ নিজেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেউ নিজের খেয়াল-খুশীমত তাতে কম-বেশী করতে পারবে না। আল্লাহ্ নির্দিষ্ট হকের পরিমাণ এবং তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব রসূলের উপর সোপর্দ করেছেন। তিনিও এ কাজটিকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তা সাহাবায়ে কেরামকে মৌখিক বলেই যথেষ্ট মনে করেননি এবং এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত ফরমান লিখে হযরত ওমর ফারুক ও আমর ইবনে হায্ম, (রাঃ)-কে সোপর্দ করেছেন। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের নেসাব এবং প্রত্যেক নেসাবে যাকাতের যে হার তা চিরদিনের জন্যে আল্লাহ্ তাঁর রসূলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে কোন যুগে বা কোন দেশে কম-বেশী বা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।

নির্ভরযোগ্য তথ্যমতে মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যাকাত ফরয হওয়ার আদেশ নাযিল হয়। তফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা মুযযাম্মিলের আয়াত فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ('সুতরাং নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর'।) — দ্বারা তাই প্রমাণ করা হয়। কারণ, সূরাটি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নাযিল হয়েছে। তবে বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের শুরুতে যাকাতের বিশেষ নেসাব বা বিশেষ হার নির্ধারণ করা হয়নি, বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকত, তা' মুসলমানগণ মুক্তহস্তে আল্লাহ্র রাহে দান করে দিতেন। হিজরতের পরে মদীনা শরীফে যাকাতের নেসাব ও হার নির্ধারণ করা হয় এবং মক্কা বিজয়ের পর সদ্কা ও যাকাত আদায়ের সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করা হয়।

সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ঐকমত্যে অত্র আয়াতে সেই ওয়াজিব সদ্কার খাতগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা মুসলমানদের জন্যে নামাযের মতই ফরয। কারণ, এ আয়াতে নির্ধারিত খাতগুলো ফরয সদ্কারই খাত। হাদীসমতে নফল সদ্কা আট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর পরিসর আরও প্রশস্ত।

যদিও পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সাধারণ অর্থেই সদ্কা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে ওয়াজিব ও নফল উভয় সদকাই শামিল রয়েছে, তবে অত্র আয়াতে ইমামগণের ঐকমত্যে কেবল ফরয সদ্কার খাতসমূহের উল্লেখ রয়েছে। তফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে যে, কোরআনে যেসব স্থানে 'সদ্কা' শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে নফল

সদ্‌কার কোন নিদর্শন না থাকলে ফরয সদ্‌কাই উদ্দেশ্য হবে।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে إِنَّمَا (কেবল) শব্দ আনা হয়। তাই শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সদ্‌কার যে সকল খাতের বর্ণনা সামনে দেয়া হচ্ছে কেবল সে খাতগুলোতেই সকল ওয়াজিব সদ্‌কা ব্যয় করা হবে। এছাড়া অন্য কোন ভাল খাতেও ওয়াজিব সদ্‌কা ব্যয় করা যাবে না। যেমন, জেহাদের প্রস্তুতি, মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ কিংবা জনকল্যাণমূলক সংস্থা প্রভৃতি। এগুলোও যে ভাল ও আবশ্যকীয় এবং তাতে ব্যয় করা যে বড় সওয়াবের কাজ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সকল সদ্‌কার হার নির্দিষ্ট, তা' এ সকল কাজে ব্যয় করা যাবে না।

আয়াতের দ্বিতীয় শব্দ 'সাদাকাত' হল সদ্‌কার বহুবচন। আরবী অভিধানে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সম্পদের সে অংশ ব্যয় করা হয়, তাকে সদ্‌কা বলা হয়। —(কামুস) ইমাম রাগেব (রাঃ) 'মুফরাদাতুল কোরআন' গ্রন্থে বলেন, দানকে সদ্‌কা বলা হয় এজন্যে যে, দানকারী প্রকারান্তরে দাবী করে যে, কথা ও কাজে সে সত্যবাদী এবং কোন পার্থিব স্বার্থে নয়, বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশেই তার এই দান-খয়রাত। বস্তুতঃ যে দানের সাথে দুনিয়ার স্বার্থ বা রিয়াকারী যুক্ত থাকে, কোরআন সে দানকে ব্যর্থ বলে গণ্য করেছে।

সদ্‌কা শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নফল ও ফরয উভয় দানই এতে শামিল রয়েছে। নফলের জন্যে শব্দটির প্রচুর ব্যবহার, তেমনি ফরয সদ্‌কার ক্ষেত্রেও কোরআনের বহুস্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً এবং আলোচ্য إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ আয়াত প্রভৃতি। বরং আল্লামা কুরতুবী (রহঃ)-এর তত্ত্ব মতে কোরআনে যেখানে শুধু সদ্‌কা শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে ফরয সদ্‌কা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আবার কতিপয় হাদীসে সদ্‌কা বলতে প্রত্যেক সৎকর্মকেও বোঝানো হয়েছে। যেমন, হাদীস শরীফে আছে, 'কোন মুসলমানের সাথে হৃষ্টচিত্তে সাক্ষাৎ করাও সদ্‌কা, কোন বোঝা বহনকারীর কাঁধে ভার তুলে দেয়াও সদ্‌কা। কূপ থেকে নিজের জন্যে উত্তোলিত পানির কিছু অংশ অন্যকে দান করাও সদ্‌কা।' এ হাদীসে সদ্‌কা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের তৃতীয় শব্দ হল لِلْفُقَرَاءِ-এর শুরুতে لَ('লাম') বর্ণটি উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাক্যের অর্থ হবে, সকল সদ্‌কা সেই লোকদেরই হক, যাদের উল্লেখ পরে রয়েছে।

আটটি খাতের বিবরণ ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খাত হল যথাক্রমে ফকীর ও মিসকীনের। আসল অর্থে যদিও পার্থক্য রয়েছে। যথা, ফকীর হল যার কিছুই নেই এবং মিসকীন হল যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। তবে যাকাতের হুকুমে সমান। মোটকথা, যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ অর্থ নেই, তাকে যাকাত দেয়া যাবে এবং সে-ও নিতে পারবে। প্রয়োজনীয় মালামালের মধ্যে থাকার ঘর, ব্যবহৃত বাসন-পেয়ালা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র প্রভৃতি শামিল রয়েছে।

সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা বা তার মূল্য যার কাছে রয়েছে এবং সে ঋণগ্রস্ত নয়, সে-ই নেসাবের মালিক। তাকে যাকাত দেয়া ও তার পক্ষে যাকাত নেয়া জায়েয নয়। অনুরূপ, যার কাছে কিছু রূপা বা নগদ কিছু টাকা এবং কিছু স্বর্ণ আছে— সব মিলে যদি সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপার সমমূল্য হয়, তবে সেও নেসাবের মালিক ; তাকেও যাকাত দেয়া নেয়া জায়েয নয়। তবে এ হিসাবে যে নেসাবের মালিক নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবান উপার্জনক্ষম এবং একদিনের খাবার সংস্থানও যার রয়েছে, তাকে যাকাত দেয়া অবশ্য জায়েয, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি তার জন্যে জায়েয নয়। এ ধরনের লোকের পক্ষে মানুষের কাছে হাত পাতা হারাম। এব্যাপারে অনেকের অসাবধানতা রয়েছে। এ ধরনের লোকেরা হাত পেতে যা গ্রহণ করে, তাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জাহান্নামের অঙ্গার বলে অভিহিত করেছেন।— (আবু দাউদ (রাঃ) হতে কুরতুবী)

অবশ্য সাধারণ সদ্‌কা অমুসলিমদেরকেও দেয়া যায়। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামেন প্রেরণ কালে যাকাত সম্পর্কে হেদায়েত দিয়েছিলেন যে, যাকাতের অর্থ শুধু মুসলিম ধনীদের থেকে নেয়া হবে এবং মুসলিম গরীবদেরকে দেয়া হবে। তাই যাকাতের অর্থ শুধু মুসলমান ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। যাকাত ব্যতীত অন্যান্য সদ্‌কা-খয়রাত এমনকি সদ্‌কায়ে ফিতর অমুসলিমদের দেয়া জায়েয।—(হেদায়া)

দ্বিতীয় শর্ত নেসাবের মালিক না হওয়া। আর তা ফকীর বা মিসকীন শব্দের অর্থেই প্রকাশ পায়। কেননা, তার নিকট হয় কিছুই থাকবে না অথবা নেসাবের পরিমাণ থেকে কম থাকবে। সুতরাং ফকীর ও মিসকীনের মধ্যে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না হওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। যাহোক, এই খাতের পর আরো ছয়টি খাতের বর্ণনা রয়েছে যার প্রথমটি হল "আমেলীনে সদ্‌কা" অর্থাৎ, সদ্‌কা আদায়কারী। এরা ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে লোকদের কাছ থেকে যাকাত ও ওশর প্রভৃতি আদায় করে বায়তুলমালে জমা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে। এরা যেহেতু এ কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে, সেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের উপর বর্তায়। কোরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত যাকাতের একাংশ তাদের জন্য রেখে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিক যাকাতের খাত থেকেই আদায় করা হবে।

এর মূল রহস্য হল এই যে, আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের থেকে যাকাত ও অপরাপর সদ্‌কা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে। অত সূরার শেষের দিকে এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً "হে রসূল, আপনি তাদের মালামাল থেকে সদ্‌কা আদায় করুন।" উক্ত আয়াত মতে রসূলের অবর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফা বা আমীরুল মু'মেনীনের উপর যাকাত ও সদ্‌কা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়। বলাবাহুল্য, সহকারী ব্যতীত আমীরের পক্ষে এ দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে "আমেলীন" বলতে যাকাত আদায়কারী তথা সেস সহকারীদের কথাই বলা হয়েছে।

এ আয়াত মতে নবী করীম (সাঃ) অনেক সাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং আদায়কৃত যাকাত থেকে তাদের পারিশ্রমিক দিতেন। এ সকল সাহাবীর অনেকে ধনীও ছিলেন। হাদীস শরীফে আছে ঃ ধনীদের জন্য সদ্‌কার অর্থ হালাল নয়, তবে পাঁচ ব্যক্তির জন্য হালাল। প্রথমতঃ যে জেহাদের উদ্দেশে বের হয়েছে, কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ তার নেই, যদিও সে স্বদেশে ধনী। দ্বিতীয়তঃ সদ্‌কা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। তৃতীয়তঃ সেই অর্থশালী ব্যক্তি, যার মজুদ অর্থের তুলনায় ঋণ অধিক। চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি মূল্য আদায় করে গরীব-মিসকীন থেকে সদ্‌কার মালামাল ক্রয় করে। প্রকমতঃ যাকে গরীব লোকেরা সদ্‌কার প্রাপ্ত মাল হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করে।

সদ্কা আদায়কারীদের কি পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হবে সে প্রশ্ন করা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে হুকুম হল, তাদের কাজ ও পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়া হবে। —(আহ্কামুল-কোরআনঃ জাস্সাস, কুরতুবী) তবে তাদের পারিশ্রমিক আদায়কৃত যাকাতের অর্ধাংশের বেশী দেয়া যাবে না। যাকাতের আদায়কৃত অর্থ যদি এত অল্প হয় যে, আদায়কারীদের বেতন দিয়ে তার অর্ধেকও বাকী থাকে না, তবে বেতনের হার হ্রাস করতে হবে। অর্ধেকের বেশী বেতন খাতে ব্যয় করা যাবে না।—(তফসীরে মাযহারী, যহীরিয়া)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, যাকাত তহ্বীল থেকে আদায়কারীদের যে বেতন দেয়া হয়, তা সদ্কা হিসেবে নয়, বরং পরিশ্রমের বিনিময় হিসেবেই দেয়া হয়। তাই তারা ধনী হলেও এ অর্থের উপযুক্ত এবং যাকাত থেকে তাদেরকে দেয়া জায়েয। আট প্রকারের ব্যয়খাতের মধ্যে এই একটি খাতই এমন যে, সেখানে স্বয়ং যাকাতের অর্থ পারিশ্রমিকরূপে দেয়া যায়। অথচ, যাকাত সে দানকেই বলা হয়, যা কোন বিনিময় ছাড়াই গরীবদের প্রদান করা হয়। সুতরাং কোন গরীবকে কাজের বিনিময়ে যাকাতের অর্থ দিলে যাকাত আদায় হবে না।

এখানে দু'টি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমতঃ যাকাত আদায়কারীদেরকে কাজের বিনিময়ে কিরূপে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে? দ্বিতীয়তঃ ধনীর জন্যে যাকাতের অর্থ কিভাবে হালাল হবে? উভয় প্রশ্নের উত্তর একটিই। তা'হল এই যে, সদ্কা আদায়কারীদের আসল পরিচয় জেনে নিতে হবে। তারা আসলে গরীবদেরই উকীলস্বরূপ। বলাবাহুল্য, উকীল কিছু গ্রহণ করলে তা মক্কেলের গ্রহণ বলেই গণ্য হয়। কেউ যদি অন্য লোককে কারো কাছ থেকে কর্জ আদায়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তবে কর্জের টাকা উকীলের হাতে অর্পণ করলেও যেমন ঋণী ব্যক্তি দায়িত্ব মুক্ত হয়, তেমনি গরীবদের উকীল হিসেবে আদায়কারীর মাধ্যমে সদ্কা আদায় করলেও ধনীদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর উকীল হিসেবে সদ্কার যে অর্থ তারা সংগ্রহ করবে, গরীবরাই তার মালিক হবে। এর পর যাকাতের অর্থ থেকে আদায়কারীর যে বেতন দেয়া হয়, তা আসলে গরীবদের পক্ষ থেকেই, ধনীদের পক্ষ থেকে নয়। গরীবরা যাকাতের অর্থ যে কোন প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে। সুতরাং যাকাতের অর্থ দ্বারা তাদের উকীলদের পারিশ্রমিক দেয়ার অধিকারও তাদের থাকবে।

অতঃপর প্রশ্ন আসে যে, যাকাত আদায়কারীদেরকে তো গরীবরা উকীল নিযুক্ত করেনি, তারা কেমন করে উকীল সেজে বসল? জবাব হল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সে দেশের সকল গরীব-মিসকীনের উকীল। কারণ, এদের ভরণ-পোষণের সমুদয় দায়িত্ব তাঁর। তিনি যাকাত আদায়ের জন্যে যাদের নিযুক্ত করেন, তারা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে গরীবদেরও উকীল সাব্যস্ত হয়।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সদ্কা আদায়কারীদের বেতন হিসেবে যা দেয়া হয় তা' মূলতঃ যাকাতের টাকা নয়; বরং যাকাত যে গরীবদের হক, সে গরীবদের পক্ষ থেকেই তা' কাজের বিনিময় মাত্র।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান যুগে ইসলামী মাদ্রাসা এবং সে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালক বা তাদের প্রতিনিধিগণ সদ্কা ও যাকাত যে ধনীদের থেকে আদায় করেন, তারা উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নন। তাই যাকাত-সদ্কা থেকে তাদের বেতন-ভাতা আদায় করা যাবে না; বরং ভিন্ন খাত থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, তারা ধনীদের উকীল, গরীবদের নয়। ধনীদের পক্ষ থেকেই যাকাতের টাকা উপযুক্ত খাতে ব্যয় করার অধিকার তাদের দেয়া হয়। সুতরাং যাকাতের টাকা তাদের হস্তগত হওয়ার পর সঠিক স্থানে ব্যয় না করা পর্যন্ত দাতাদের যাকাতও আদায় হবে না।

তারা যে গরীবদের উকীল নয়, তা সুস্পষ্ট। কারণ, কোন গরীব তাদের উকীল নিযুক্ত করেননি এবং আমীরুল মুমেনীনের প্রতিনিধিত্বও তারা করেন না। তাই তাদের পক্ষে ধনীদের উকীল হওয়া ব্যতীত আর কোন পথ খোলা নেই। সুতরাং যাকাত খাতে ব্যয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যাকাতের টাকা তাদের হাতে থাকা ও মালিকের হাতে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এ ব্যাপারে সাধারণতঃ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না। বহু প্রতিষ্ঠান যাকাতের বিস্তর টাকা সংগ্রহ করে বছরের পর বছর সিন্ধুকে তালাবদ্ধ করে রাখে। আর যাকাতদাতারা মনে করে যে, যাকাত আদায় হয়ে গেল। অথচ তাদের যাকাত আদায় হবে তখনই, যখন তা যাকাতের নির্ধারিত যে কোন একটি খাতে ব্যয়িত হবে।

অনুরূপ অনেকে বর্তমান যুগের যাকাত আদায়কারীদেরকে আমীরুল মুমেনীনের প্রতিনিধিবর্গের সাথে তুলনা করে যাকাতের অর্থ থেকে তাদের বেতন পরিশোধ করে। একান্তভাবেই এটি অজ্ঞতাপ্রসূত। দাতা ও গ্রহীতা কারো পক্ষেই তা জায়েয নয়।

এবাদতের পারিশ্রমিক গ্রহণ ঃ এখানে আরও একটি প্রশ্ন আসে। কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিত এবং হাদীসের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোন এবাদতের বিনিময় ও মজুরী নেয়া হারাম। মুসনাদে আহ্মদে বর্ণিত এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ اقرءوا القرآن ولا تأكلوابه অর্থাৎ, "কোরআন পাঠ কর, কিন্তু কোরআনকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে পরিণত করো না।" অপর হাদীসে কোরআন দ্বারা উপার্জিত বস্তুকে জাহান্নামের অংশ বলা হয়েছে। এসব হাদীসের প্রেক্ষিতে ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ একমত যে, এবাদত-বন্দেগীর পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে সদ্কা-খয়রাত আদায় করাও এবাদত ও দ্বীনের একটি সেবা। রসূলে করীম (সাঃ) একে এক প্রকারের জেহাদ বলে অভিহিত করেছেন। তাই এ এবাদতের মজুরী গ্রহণ করাও হারাম হওয়া সঙ্গত। অথচ কোরআনের আলোচ্য আয়াতটি তা স্পষ্টরূপে জায়েয করে দিয়েছে এবং যাকাতের আট খাতের মধ্যে একেও শামিল করেছে।

ইমাম কুরতুবী (রাঃ) তাঁর তফসীরে বলেন, যে এবাদত ফরযে আইন বা ওয়াজেবে আইন, তার পারিশ্রমিক নেয়া সর্বাবস্থায় হারাম। কিন্তু যে এবাদত ফরযে কেফায়াহ্, তার বিনিময় নেয়া এ আয়াত মতে জায়েয। ফরযে কেফায়াহ্ হল, যা সকল উম্মত বা শহরের সকল বাসিন্দার জন্যে ফরয, কিন্তু সকলের আদায় করা জরুরী নয়, কিছু লোক আদায় করলেই সবাই দায়িত্ব মুক্তি হয়। কিন্তু কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হয়।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, "এ আয়াত মতে ইমামতি ও ওয়ায-নসীহতের পারিশ্রমিক নেয়াও জায়েয রয়েছে। কারণ, এগুলো ওয়াজেবে-আইন নয়; বরং ওয়াজেবে-কেফায়াহ্।" অনুরূপ কোরআন-হাদীস ও অপরাপর দ্বীনী এলমের তালীম ও প্রচার সকল উম্মতের জন্যেই ফরযে-কেফায়াহ। কতিপয় লোক দায়িত্ব পালন করলে সকলেই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। তাই এ সকল এবাদতের বিনিময় নেয়া জায়েয।

যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত হল 'মুআল্লাফাতুল কুলূব'। সাধারণতঃ তারা

তিন-চার শ্রেণীর বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলমান, কিছু অমুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে কেউ ছিল চরম অভাবগ্রস্ত এবং নওমুসলিম, এদের চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থা এজন্যে নেয়া হয়, যেন তাদের ইসলামী বিশ্বাস পরিপক্ক হয়। আর কেউ ছিল ধনী, কিন্তু তাদের অন্তর তখনো ইসলামে রঞ্জিত হয়নি। আর কেউ কেউ ছিল পরিপক্ক মুসলমান, কিন্তু তার গোত্রকে এর দ্বারা হেদায়েতের পথে আনা উদ্দেশ্য ছিল। অমুসলমানদের মধ্যেও এমন অনেকে রয়েছে, যাদের শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্যে তাদের পরিতুষ্ট রাখার প্রয়োজন ছিল। আর কেউ ছিল, যারা ওয়ায নসীহত কিংবা যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও ইসলামে প্রভাবিত হচ্ছে না; বরং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা দয়া, দান ও সদ্ব্যবহারে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। রসূলে করীম (সাঃ)-এর সমগ্র জীবনের ব্রত ছিল কুফরীর অন্ধকার থেকে আল্লাহ্র বন্দাদের ঈমানের আলোয় নিয়ে আসা। তাই এ ধরনের লোকদের প্রভাবিত করার জন্য যে কোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করতেন। এরা সবাই মুআল্লাফাতুন কুলূবের অন্তর্ভুক্ত এবং আলোচ্য আয়াতে এদেরকে সদ্কার চতুর্থ ব্যয়খাত রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, এদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদ্কার অংশ দেয়া হত। সাধারণ ধারণা মতে মুসলিম-অমুসলিম উভয় শ্রেণীই এতে রয়েছে। অমুসলিমদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে, আর নওমুসলিমদের পরিতুষ্ট করা হয় ইসলামের উপর অবিচল থাকার জন্য। জনশ্রুতি রয়েছে যে, নবী-যুগে উল্লেখিত বিশেষ কারণে এদের সদ্কা দান করা হত। কিন্তু হযরত (সাঃ)-এর ওফাতের পর যখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কাফেরদের শত্রুতা থেকে বাঁচা ও নওমুসলিমদের আকীদা পোক্ত করার জন্য এ সকল পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন তিরোহিত হয়ে যায়, তখন সেই কারণ ও উদ্দেশ্য আর বাকী থাকেনি। তাই তাদের সদ্কা দানও বন্ধ করে দেয়া হয়। কতিপয় ফেকাহবিদ এ অবস্থার প্রেক্ষিতে হুকুমটি রহিত বলে মন্তব্য করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ), হযরত হাসান বসরী, শা'বী, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহঃ)।

তবে অপরাপর ইমাম ও ফেকাহবিদগণের মতে হুকুমটি রহিত নয়; বরং হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যুগে প্রয়োজন ছিল না বলে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় প্রয়োজন দেখা দিলে এই শ্রেণীর লোকদিগকে যাকাতের অংশ দেয়া যাবে। এ মতের অনুসারী হলেন ইমাম যুহরী, কাযী আবদুল ওহাব ইবনে আরবী, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)।

প্রকৃত সত্য কথা হল এই যে, কোন যুগেই সদকা প্রভৃতি থেকে অমুসলিমদের অংশ দেয়া হয়নি এবং তারা যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত— 'মুআল্লাফাতুলকুলূবে' শামিল ছিল না।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে রসূলে করীম (সাঃ) যাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদ্কার খাত থেকে দান করেছিলেন, সবিস্তারে তাদের নামধামসহ উল্লেখ করে বলেছেন, وبالجملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر অর্থাৎ, তারা ছিল মুসলমান, তাদের মধ্যে অমুসলমান বলতে কেউ ছিল না।

অনুরূপ তফসীরে মাযহারীতে আছেঃ

لم يثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم اعطى احدا من الكفار للايلاف شيئامن الزكوٰة অর্থাৎ, কোন রেওয়ায়েত থেকে একথা প্রমাণিত নেই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাফেরদের চিত্তাকর্ষণের জন্য যাকাতের অংশ দিয়েছিলেন। এ কথার সমর্থনে তফসীরে কাশ্শাফের একটি উক্তি পেশ করা যায়। তাতে উল্লেখ আছে যে, "কোরআনে এ স্থানে যাকাতের ব্যয়খাতের বর্ণনার উদ্দেশ্য হল কাফের-মুনাফেকদের অপবাদ খন্ডন করা যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সদকার অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করেছেন। আয়াতে এই ব্যয়-খাতসমূহের বিবরণ দিয়ে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, সদকায় কাফেরদের কোন অধিকার নেই। মুআল্লাফাতুল কুলূবে কাফেরগণ শামিল থাকলে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না।"

তফসীরে মাযহারীতে সে ভ্রমটিকেও অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে; যা কোন কোন হাদীসের রেওয়ায়েতের দরুন মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে। সেসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন কোন অমুসলিমদেরকেও কিছু উপঢৌকন দিয়েছেন। সুতরাং সহীহ্ মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে সে কথা উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ্কে তার কাফের থাকাকালে কিছু উপঢৌকন দান করেছেন, সে সম্পর্কে ইমাম নববী (রহঃ)-এর উদ্ধৃতিক্রমে লেখা হয়েছে যে, এসব দান যাকাতের মালের মধ্য থেকে ছিল না; বরং হুনাইন যুদ্ধের গনীমতের মালের যে পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার মধ্য থেকেই দেয়া হয়েছিল। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, বায়তুলমালের এই খাত থেকে মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের জন্য ব্যয় করা সমস্ত ফেকাহবিদগণের ঐকমত্যেই জায়েয। অতঃপর বলা হয়েছে, ইমাম বায়হাকী (রহঃ), ইবনে সাইয়্যেদুন্নাস, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ সবাই বলেছেন যে, এ দান যাকাতের মাল থেকে ছিল না, বরং গনীমতের পঞ্চমাংশ থেকে ছিল।

এ পর্যন্ত সদ্কার আটটি ব্যয়ক্ষেত্রের চারটির বিবরণ দান করা হল। এ চারটির অধিকার 'লাম' বর্ণের আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ পরবর্তীতে যে চারটি ব্যয়খাতের আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শিরোনাম পরিবর্তন করে 'লাম'-এর পরিবর্তে فِي (ফী) ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ইমাম যামাখ্শারী তাঁর কাশ্শাফ গ্রন্থে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, শেষের এ চারটি ব্যয়খাত প্রথম চারটি ব্যয়খাতের তুলনায় বেশী হকদার। কারণ, فِي হরফটি পাত্রকে বোঝাবার জন্য বলা হয়। ফলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সদ্কাসমূহ যে সমস্ত লোকের মাঝে রেখে দেয়া উচিত। তাদের অধিকতর হকদার হওয়ার কারণ এই যে, প্রয়োজনীয়তা তাদেরই অধিক। কেননা, যে লোক কারো মালিকানাধীন দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, সে সাধারণ ফকীর-মিসকীনদের তুলনায় অধিক কষ্টে রয়েছে। তেমনিভাবে যে লোক কারো কাছে ঋণী এবং পাওনাদাররা তার উপর তাকাদা করছে, সে সাধারণ গরীব-মিসকীন অপেক্ষা অধিক অভাবে থাকে। কারণ, নিজের দৈনন্দিন ব্যয়ভারের চাইতেও বেশী চিন্তা থাকে তার পাওনাদারদের প্রতি।

আরেকটি ব্যয়খাত হল الْغَارِمِينَ যা غارم এর বহুবচন। এর অর্থ দেনাদার, ঋণী। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যয়খাত যা فِي-এর সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রাপ্যতার অধিকারে প্রথম চারটি ব্যয়খাত অপেক্ষা অগ্রগণ্য। সেজন্য গোলামকে তার মুক্তির জন্য কিংবা ঋণগ্রস্তকে তার ঋণমুক্তির জন্য দান করা সাধারণ ফকীর-মিসকীনকে দান করার চাইতে উত্তম। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, সে ঋণগ্রস্তের কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, যাতে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কারণ, অভিধানে এমন ঋণী ব্যক্তিকেই غارم (গারেম) বলা

হয়। আবার কোন কোন ইমাম এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, সে ঋণ কোন অবৈধ কাজের জন্য না করে থাকে। কোন পাপ কাজের জন্য যদি ঋণ করে থাকে—যেমন, মদ কিংবা বিয়ে-শাদীর নাজায়েয খরচ-অনুষ্ঠান প্রভৃতি, তবে এমন ঋণগ্রস্তকে যাকাতের অর্থ থেকে দান করা যাবে না; যাতে তার পাপ কাজও অপব্যয়ে অনর্থক উৎসাহ দান করা না হয়।

فى سبيل الله এখানে আবারো فى হরফের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তফসীরে-কাশ্‌শাফে বর্ণিত রয়েছে যে, এই পুনরাবৃত্তিতে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, এ খাতটি পূর্বোল্লেখিত সব খাত অপক্ষো উত্তম। তার কারণ এই যে, এতে দু'টি ফায়দা রয়েছে। (১) গরীব-নিঃস্বের সাহায্য এবং (২) একটি ধর্মীয় সেবায় সহায়তা করা। কারণ فى سبيل الله -এর মর্ম সেসব গাযী ও মুজাহিদ, যাদের অস্ত্র ও জেহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই অথবা ঐ ব্যক্তি যার উপর হজ্ব ফরয হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আর তার কাছে এমন অর্থ নেই যাতে সে ফরয হজ্ব আদায় করতে পারে। এ দু'টি কাজই নির্ভেজাল ধর্মীয় খেদমত ও এবাদত। কাজেই যাকাতের মাল এতে ব্যয় করায় একজন নিঃস্ব লোকের সাহায্য হয় এবং একটি এবাদত আদায়ের সহযোগিতাও হয়। এমনিভাবে ফেকাহবিদগণ ছাত্রদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ, তারাও একটি এবাদত আদায় করার জন্যই এ ব্রত গ্রহণ করে থাকে।— (যাহেরিয়ার হাওয়ালায় রূহুল-মা'আনী)

বাদায়ে, প্রণেতা বলেছেন যে, এমন প্রত্যেক লোকই 'ফী-সাবীলিল্লাহ' খাতের আওতাভুক্ত যে কোন সৎকাজ কিংবা এবাদত করতে চায় যাতে অর্থের প্রয়োজন। অবশ্য এতে শর্ত এই যে, তার কাছে এমন অর্থ-সম্পদ থাকবে না যদ্দারা সংশ্লিষ্ট সে কাজটি সম্পাদন করতে পারে। যেমন, ধর্মীয় শিক্ষা ও তবলীগ এবং সে জন্য প্রচার প্রকাশনা প্রভৃতি। কোন যাকাতের হকদার লোক যদি এ কাজ করতে চায়, তবে তাকে যাকাতের মাল দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে, কিন্তু কোন মালদার লোককে তা দেয়া যায় না।

উল্লেখিত বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, এ সমস্ত অবস্থাতেই যা فى سبيل الله -এর তফসীরে বর্ণনা করা হলো দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততার শর্তটির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কোন ধনী সাহেবে-নেসাবের কোন অংশ এতে নেই। অবশ্য যদি তার বর্তমান মালামাল তার সে প্রয়োজন মেটাতে না পারে, যা জেহাদ কিংবা হজ্বের জন্য প্রয়োজন, তবে যদিও নেসাব পরিমাণ মালামাল বর্তমান থাকার কারণে তাকে ধনী বলা যেতে পারে—যেমন এক হাদীসেও তাকে غنى (ধনী) বলা হয়েছে, কিন্তু সেও এ হিসাবে ফকীর ও অভাবগ্রস্ত বলে গণ্য হবে। যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ জেহাদ অথবা হজ্বের জন্য প্রয়োজন তা তার কাছে বর্তমান নয়। 'ফতহুল-কাদীর' গ্রন্থে শাইখ ইবনে-হুমাম (রহঃ) বলেছেন, সদকা সংক্রান্ত আয়াতসমূহে যেসব ব্যয়খাতের কথা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটির শব্দ স্বয়ং এর প্রমাণ বহন করে যে, সে তার দৈন্য ও অভাবের ভিত্তিতেই হকদার। ফকীর ও মিসকীন শব্দে তো তা সুস্পষ্ট রয়েছেই ; রেকাব, গাবেরীন, ফী-সাবীলিল্লাহ, ইবনুসসাবীল প্রভৃতি শব্দও এরই ইঙ্গিতবহ যে, তাদের অভাব দূর করার ভিত্তিতেই তাদেরকে দান করা হয়। অবশ্য যারা عاملين (আমেলীন) যাকাত উসুলকারী— তাদেরকে দেয়া হয় তাদের সেবার বিনিময়ে। সুতরাং এতে আমীর-ফকীর সমান। যেমন, غارمين এর খাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে লোকের উপর দশ হাজার টাকার ঋণ রয়েছে এবং পাঁচ হাজার টাকা তার কাছে রয়েছে, তাকে পাঁচ হাজার টাকার যাকাত দেয়া যেতে পারে। কারণ, যে মাল তার কাছে মওজুদ রয়েছে, তা তার ঋণের দরুন না থাকারই শামিল।

জ্ঞাতব্য ঃ فى سبيل الله শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক। যেসব কাজ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে করা হয়, সে সবই এই ব্যাপক মর্মানুযায়ী فى سبيل الله -এর অন্তর্ভুক্ত। যেসব লোক রসূলে করীম (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের বক্তব্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে কোরআনকে বুঝতে চায়, এখানে তাদের এ বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, তারা فى سبيل الله শব্দটি দেখেই সে সমস্ত কাজকেও যাকাতের ব্যয়-খাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, যা কোন কোন দিক দিয়ে সৎকাজ কিংবা এবাদত বলে গণ্য। মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ, কূপ খনন, পুল ও সড়ক তৈরী করা এবং সেসব জনকল্যাণমূলক সংস্থার কর্মচারীদের বেতন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা فى سبيل الله -এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে যাকাতের ব্যয়খাত সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, যা একান্তই ভুল এবং সমগ্র উম্মতের ইজমার পরিপন্থী। সাহাবায়ে-কেরাম, যাঁরা কোরআনকে সরাসরি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট অধ্যয়ন করেছেন ও বুঝেছেন, তাঁদের এবং তাবেয়ীন ইমামগণের যত রকম তফসীর এ শব্দটির ব্যাপারে উদ্ধৃত রয়েছে তাতে এ শব্দটিকে হজ্বব্রতী ও মুজাহেদীনের জন্য নির্দিষ্ট বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর একটি উট فى سبيل الله (ফী-সাবীল্লিাহ্) ওয়াকফ করে দিয়েছিল। তখন মহানবী (সাঃ) সে লোকটিকে বলে দেন যে, একে হাজীদের সফরের কাজে ব্যবহার করো।—(মবসূত ৩, পৃঃ - ১০)

ইমাম ইবনে জরীর, ইবনে-কাসীর প্রমুখ হাদীসের রেওয়ায়েতের দ্বারাই কোরআনের তফসীর করেন। তাঁদের সবাই فى سبيل الله শব্দকে এমন মুজাহেদীন ও হজ্বব্রতীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যাদের কাছে জেহাদ কিংবা হজ্ব করার উপকরণ নেই। আর যেসব ফেকাহবিদ মনীষীবৃন্দ তালেবে-এলম কিংবা অন্যান্য সৎকর্মীদিগকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁরাও এ শর্তেই তা করেছেন যে, তাদেরকে ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হতে হবে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, ফকীর ও অভাবগ্রস্তরা নিজেই যাকাতের সর্বপ্রথম ব্যয়খাত। এদেরকে ফী-সাবীলিল্লাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও এরা যাকাতের হকদার ছিল। কিন্তু চার ইমাম ও উম্মতের ফেকাহ্‌বিদগণের কেউই একথা বলেননি যে, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণে এবং সে সমস্তের যাবতীয় প্রয়োজন যাকাতের ন্যায়খাতের অন্তর্ভুক্ত। বরং তাঁরা এ বিষয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, যাকাতের মালামাল এসব বিষয়ে ব্যয় করা না জায়েয। হানাফী ফেকাহবিদ ইমামগণের মধ্যে শামসুল আয়েম্মা সারাখ্‌সী মবসূত দ্বিতীয় খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠায় এবং শরহে-সিয়ার চতুর্থ খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠায়, শাফেয়ী ফেকাহবিদগণের মধ্যে আবু ওবায়েদ 'কিতাবুল-আমওয়াল' গ্রন্থে, মালেকী ফেকাহবিদগণের 'দার্দেজ শরহে মুখতাসারুল খলীল' প্রথম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠায় এবং হাম্বলী ফেকাহবিদগণের মধ্যে মুত্তাফিক মুগনী গ্রন্থে এ বিষয়টি সবিস্তারে লিখেছেন।

ابن السبيل (ইবনুস-সাবীল)। سبيل অর্থ পথ। আর ابن অর্থ মূলতঃ পুত্র হলেও আরবী পরিভাষায় ابن - اب ও اخ প্রভৃতি সে সমস্ত বিষয়ের জন্যও বলা হয়, যার গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক কারো সাথে থাকে। এই পরিভাষা অনুযায়ী ابن السبيل বলা হয় পথিক ও মুসাফিরকে। কারণ, পথ অতিক্রম করা এবং গন্তব্য-স্থানের সন্ধান করার সাথে তাদের সম্পর্কও অতি নিবিড়। আর যাকাতের ব্যয়খাতের ক্ষেত্রে এমন মুসাফির বা পথিককে বুঝানোই উদ্দেশ্য; যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনীয়

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا
أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ
أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ
قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِنْ
سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ
وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ
كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ
نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ الْمُنَافِقُونَ
وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا
اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ اللَّهُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٦٨﴾

(৬২) তোমাদের সামনে আল্লাহ্র কসম খায় যাতে তোমাদের রাযী করতে পারে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্কে এবং তাঁর রসূলকে রাযী করা অত্যন্ত জরুরী। (৬৩) তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্র সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সব সময় থাকবে। এটিই হল মহা-অপমান। (৬৪) মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন কোন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক ; আল্লাহ্ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। (৬৫) আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্র সাথে, তাঁর হুকুম-আহ্কামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? (৬৬) ছলনা করো না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহ্গার। (৬৭) মুনাফেক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম; শিখায় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহ্কে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফেকরাই নাফরমান। (৬৮) ওয়াদা করেছেন আল্লাহ্ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের- তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আজাব।

অর্থ-সম্পদ নেই, স্বদেশে তার যত অর্থ-সম্পদই থাক না কেন। এমন মুসাফিরকে যাকাতের মাল দেয়া যেতে পারে, যাতে করে সে তার সফরের প্রয়োজনাদি সমাধা করতে পারবে এবং স্বদেশে ফিরে যেতে সমর্থ হবে।

এ পর্যন্ত যাকাতের সে আটটি খাতের বিবরণ সমাপ্ত হল, যা উল্লেখিত আয়াতে সদ্কা ও যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবার এমন কিছু মাসআলা বর্ণনা করা যাচ্ছে যেগুলো একইভাবে সে সমস্ত খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মালিকানা : অধিকাংশ ফেকাহ্বিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করার ব্যাপারেও যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে যে, এসব খাতে কোন হকদারকে যাকাতের মালের উপর মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার দিয়ে দিতে হবে। মালিকানা অধিকার দেয়া ছাড়া যদি কোন মাল তাদেরই উপকার কল্পে ব্যয় করা হয়, তবুও যাকাত আদায় হবে না। সে কারণেই চার ইমামসহ উম্মাহ্র অধিকাংশ ফেকাহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের অর্থ মসজিদ-মাদ্রাসা কিংবা হাসপাতাল-এতীমখানা প্রভৃতি নির্মাণ অথবা তাদের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েয নয়। যদিও এসব বিষয়ের উপকারিতা সেই ফকীর-মিসকীন ও প্রাপ্ত হয়, যারা যাকাতের খাত হিসাবে গণ্য, কিন্তু তাদের মালিকানা স্বত্ব এসব বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না।

অবশ্য এতীমখানাগুলোতে যদি মালিকানা স্বত্ব হিসাবে এতীমদের খাওয়া-পরা দেয়া হয়, তবে সে ব্যয়ের অনুপাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। তেমনিভাবে হাসপা তালসমূহে সেযব ওষুধ অভাবী গরীবদিগকে মালিকানা অধিকার মোতাবেক দিয়ে দেয়া হয়, তার মূল্যও যাকাতের অর্থে পরিশোধ করা যেতে পারে। এমনিভাবে উম্মাহ্র ফেকাহ্বিদগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী লা-ওয়ারিস মৃতের কাফন যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যেতে পারে না। কারণ, মৃতের মালিক হওয়ার যোগ্যতা থাকে না। তবে যাকাতের অর্থ যদি কোন গরীব হকদার লোককে দিয়ে দেয়া হয় এবং সে স্বেচ্ছায় সে অর্থ লা-ওয়ারিস মৃতের কাফনে ব্যয় করে, তাহলে তা জায়েয। তেমনিভাবে যদি সে মৃতর উপর ঋণ থাকে, তবে সে ঋণ সরাসরি যাকাতের অর্থের দ্বারা আদায় করা যায় না। তবে তার কোন ওয়ারিস যদি গরীব ও যাকাতের হকদার হয়, তবে তাকে মালিকানার ভিত্তিতে তা দেয়া যেতে পারে। তখন সে অর্থের মালিক হয়ে নিজের ইচ্ছায় তদ্দ্বারা মৃতের ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এমনিভাবে জনকল্যাণমূলক যাবতীয় কাজকর্ম—যেমন, কূপ খনন, পুল নির্মাণ কিংবা সড়ক তৈরী প্রভৃতি। যদিও এসবের মাধ্যমে যাকাত পাবার যোগ্য লোকেরাও উপকৃত হয়, কিন্তু এতে তাদের মালিকানা, অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না।

মালিকুল-ওলামা তাঁর 'বেদায়াহ্' গ্রন্থে যাকাত আদায় হওয়ার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার শর্তের পক্ষে দলীল দিয়েছেন যে, কোরআনে সাধারণতঃ যাকাত ও ওয়াজিব সদকার ক্ষেত্রে ايتاء শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ — أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ — وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ — وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَوٰةِ

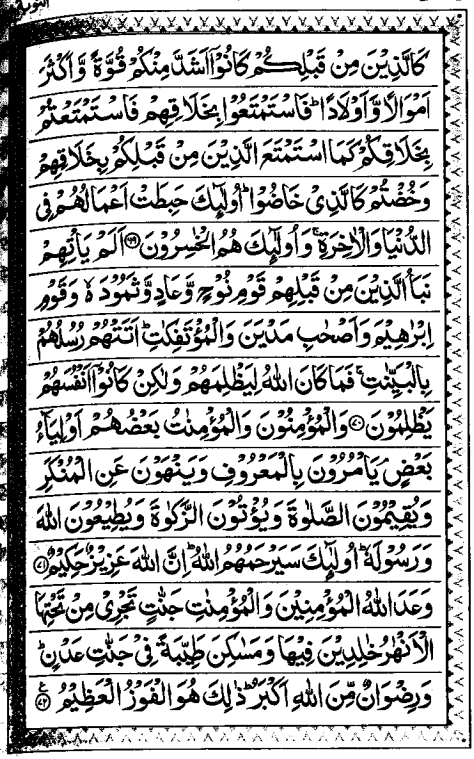

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ
اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۭ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ
وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ۭ اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ اَلَمْ يَاْتِهِمْ
نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ
اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ۭ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ ۭ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ۝ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ
بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝
وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

(৬৯) যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তোমাদের চেয়ে বেশী ছিল শক্তিতে এবং ধন-সম্পদের ও সন্তান-সন্ততির অধিকারীও ছিল বেশী ; অতঃপর উপকৃত হয়েছে নিজেদের ভাগের দ্বারা। আবার তোমরা ফায়দা উঠিয়েছ তোমাদের ভাগের দ্বারা- যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ফায়দা উঠিয়েছিল নিজেদের ভাগের দ্বারা। আর তোমরাও চলছ তাদেরই চলন অনুযায়ী। তারা ছিল সে লোক, যাদের আমলসমূহ নিঃশেষিত হয়ে গেছে দুনিয়া ও আখেরাতে। আর তারাই হয়েছে ক্ষতির সম্মুখীন। (৭০) তাদের সংবাদ কি এদের কানে এসে পৌঁছায়নি, যারা ছিল তাদের পূর্বে; নূহের আ'দের ও সামূদের সম্প্রদায় এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এবং মাদইয়ানবাসীদের? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেয়া হয়েছিল? তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নবী পরিষ্কার নির্দেশ নিয়ে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তো এমন ছিলেন না যে, তাদের উপর জুলুম করতেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করতো। (৭১) আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ্ তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (৭২) আল্লাহ্ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুতঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। এটিই হল মহান কৃতকার্যতা।

প্রভৃতি আর ايتاء শব্দটি অভিধানে দান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম রাগেব ইসপাহানী (রহঃ) 'মুফরাদাতে-কোরআন' গ্রন্থে বলেছেন— والايتاء الاعطاء وخص وضع الصدقة فى القران بالايتاء অর্থাৎ, ঈতা' অর্থ দান করা। আর কোরআনে ওয়াজিব সদকা আদায় করাকে ঈতা শব্দের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। 'আর একথা বলাই বাহুল্য যে, কাউকে কোন কিছু দান করার মর্ম এটাই যে, তাকে সে বস্তুর মালিক বানিয়ে দেয়া হবে।

তাছাড়া যাকাত ছাড়াও ايتاء শব্দটি কোরআন করীমে মালিক বানিয়ে দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ অর্থাৎ, স্ত্রীদিগকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও। আর একথা সুস্পষ্ট যে, মোহরানা পরিশোধ করা হয়েছে বলে তখনই স্বীকৃত হবে যখন, মোহরের উপর স্ত্রীর মালিকানা স্বত্ব দিয়ে দেয়া হবে।

দ্বিতীয়তঃ কোরআন করীমে যাকাতকে 'সদ্কা' শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ আর صدقة (সদ্কাহ্)-এর প্রকৃত অর্থ তাই যে, কোন ফকীর-অভাবগ্রস্তকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া হবে।

কাউকে খাবার খাইয়ে দেয়া কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দেয়াকে প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে 'সদ্কা' বলা হয় না। শায়খ-ইবনে হুমাম 'ফাতহুল-কাদীর' গ্রন্থে বলেছেন, সদকার তাৎপর্যও তাই যে, কোন কাফেরকে সে মালের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে। এমনিভাবে ইমাম জাসসাস 'আহ্কামুল-কোরআনে' বলেছেন, 'সদ্কা' শব্দটি হল মালিক করে দেয়ার নাম।-(জাসসাস ২য় খঃ ১৫২ পৃঃ)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ আয়াতে কাফের ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জেহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে যারা কাফের তাদের সাথে জেহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জেহাদ করার অর্থ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কর্মধারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের সাথে জেহাদ করার মর্ম হল মৌখিক জেহাদ। অর্থাৎ, তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবীতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে।- (কুরতুবী, মাযহারী)

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ - এতে غلظ এর প্রকৃত অর্থ হল এই যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে আচরণের যোগ্য হবে তাতে কোন রকম রেয়ায়েত বা কোমলতা যেন না করা হয়। এ শব্দটি رأفت এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হল কোমলতা ও করুণা।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন যে, এক্ষেত্রে غلظت শব্দ ব্যবহারে বাস্তব ও কার্যকর কঠোরতাই বোঝানো হয়েছে যে, তাদের উপর শরীয়তের হুকুম জারী করতে গিয়ে কোন রকম দয়া বা কোমলতা করবেন না। মুখে বা কথায় কঠোরতা প্রদর্শন করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তা নবী-রসূলগণের রীতি বিরুদ্ধ। তাঁরা কারো প্রতি কটুবাক্য কিংবা গালাগালি করতেন না। এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— "যদি তোমাদের কোন ক্রীতদাসী যিনায় লিপ্ত হয়, তবে শরীয়ত অনুযায়ী তার

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَ
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا
وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا
بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا
يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ
فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ
آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾
فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾
فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا
اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

(৭৩) হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে ; তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা।
(৭৪) তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তুতঃ এরা যদি তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তবে তাদেরকে আযাব দেবেন আল্লাহ্ তাআলা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে। অতএব, বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী-সমর্থক নেই। (৭৫) তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ্ তাআলার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। (৭৬) অতঃপর যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করা হয়, তখন তাতে কার্পণ্য করেছে এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গেছে তা ভেঙ্গে দিয়ে। (৭৭) তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা লংঘণ করেছিল এবং এজন্যে যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো। (৭৮) তারা কি জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্ তাদের রহস্য ও সলা-পরামর্শ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ্ খুব ভাল করেই জানেন সমস্ত গোপন বিষয়? (৭৯) সে সমস্ত লোক যারা ভৎর্সনা-বিদ্রূপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

উপর শাস্তি প্রয়োগ কর, কিন্তু মুখে তাকে ভর্ৎসনা বা গালাগালি করো না।' – (কুরতুবী)

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন-

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

"আপনি যদি কটুবাক্য ও কঠোরমনা হতেন, তবে আপনার কাছ থেকে মানুষ পালিয়ে যেত।" তাছাড়া স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রীতি-নীতিতেও কোথাও একথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, কখনো তিনি কাফের ও মুনাফিকদের সাথে কথা বলতে বা তাদের সম্বোধন করতে গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ -তে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠক-সমাবেশে কুফরী কথা বার্তা বলতে থাকে এবং তা যখন মুসলমানরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের সুচিতা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী (রহঃ) এ আয়াতের শানে-নুযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) গযওয়ায়ে তাবুক প্রসঙ্গে এক ভাষণ দান করেন যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দুরবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজ বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ (সাঃ) যা কিছু বলেন তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাইতেও নিকৃষ্ট। তার এ বাক্যটি আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) নামক এক সাহাবী শুনে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন তাবুকের সফর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তখন আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) এ ঘটনা মহানবী (সাঃ)-কে বলেন। জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে (আমি এমন কথা বলিনি)। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উভয়কে 'মিম্বরে-নববী'র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নেয় যে, আমি এমন কথা বলিনি, আমের মিথ্যা কথা বলছে। হযরত আমের (রাঃ)-এর পালা এলে তিনিও (নিজের বক্তব্য সম্পর্কে) কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন যে, আয় আল্লাহ্, আপনি ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রসূলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তাঁর প্রার্থনায় স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সমস্ত মুসলমান 'আমীন' বললেন। অতঃপর সেখান থেকে তাঁদের সরে আসার পূর্বেই জিবরীলে-আমীন ওহী নিয়ে হাযির হন যাতে উল্লেখিত আয়াতখানি নাযিল হয়।

জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রসূলাল্লাহ্, এখন আমি স্বীকার করছি যে, এ ভুলটি আমার দ্বারা হয়ে গিয়েছিল।

আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তওবা করার অবকাশ দান করেছেন। কাজেই এখনই আমি আল্লাহ্ তাআলার নিকট মাগফেরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তওবা করছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর তওবা কবুল করে নেন এবং অতঃপর তিনি নিজ তওবায় অটল থাকেন। তাতে তার অবস্থাও শুধরে যায়।—(মাযহারী)

কোন কোন তফসীরবিদ মনীষী এ আয়াতের শানে-নুযূল প্রসঙ্গে এমনি ধরনের অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন। বিশেষতঃ এজন্য যে, আয়াতে এ বাক্যটিও রয়েছে যে, وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا অর্থাৎ, তারা এমন এক কাজের চিন্তা করল, যাতে তারা কৃতকার্য হতে পারেনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি এমন কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত যাতে মুনাফিকরা মহানবী (সাঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে কৃতকার্য হতে পারেনি। যেমন, উক্ত গযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা যে, মুনাফিকদের বার জন লোক পাহাড়ী এক ঘাঁটিতে এমন উদ্দেশে লুকিয়ে রয়েছিল যে, মহানবী (সাঃ) যখন এখানে এসে পৌঁছবেন, তখন আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এব্যাপারে হযরত জিব্‌রীলে-আমীন তাঁকে খবর দিয়ে দিলে তিনি এ পথ থেকে সরে যান এবং এতে করে তাদের হীনচক্রান্ত ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়।

এছাড়া মুনাফিকদের দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাও সংঘটিত হয়। তবে এসবের মধ্যে কোন বৈপরীত্ব কিংবা বিরোধ নেই। এ সমুদয় ঘটনাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ এ আয়াতটিও এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। ইবনে জরীর, ইবনে-আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, তাবারানী ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক সা'লাবাহ্ ইবনে হাতেম আনসারী রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল যে, হুযূর দোয়া করে দিন যাতে আমি মালদার ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ নয়? সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে মদীনার পাহাড় সোনা হয়ে গিয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরত। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দ নয়। তখন লোকটি ফিরে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল এবং আবারো একই নিবেদন করল এ চুক্তির ভিত্তিতে যে, যদি আমি সম্পদপ্রাপ্ত হয়ে যাই, তবে আমি প্রত্যেক হকদারকে তার হক বা প্রাপ্য পৌঁছে দেব। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দোয়া করে দিলেন। যার ফল এই দাঁড়ায় যে, তার ছাগল-ভেড়ায় অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমনকি মদীনায় বসবাসের জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে বাইরে চলে যায়। তবে যোহর ও আসরের নামায মদীনায় এসে মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গেই আদায় করতো এবং অন্যান্য নামায সেখানেই পড়ে নিত যেখানে তার মালামাল ছিল।

অতঃপর এ সমস্ত ছাগল-ভেড়ার আরো প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিতেও তার সংকুলান হয় না। সুতরাং মদীনা শহর থেকে আরো দূরে গিয়ে কোন একটি জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে শুধু জুম'আর নামাযের জন্য সে মদীনায় আসত এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামাযগুলো সেখানেই পড়ে নিত। তারপর এসব মালামাল আরো বেড়ে গেলে সে জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদীনা থেকে বহু দূরে চলে যায়। সেখানে জুম'আ ও জামাআত সব কিছু থেকেই তাকে বঞ্চিত হতে হয়।

কিছুদিন পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে লোকেরা বলল যে, তার মালামাল এত বেশী বেড়ে গেছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। ফলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে সে বসবাস করছে। এখন আর তাকে এখানে দেখা যায় না। রসূলে করীম (সাঃ) একথা শুনে তিন বার বললেন- يا ويح ثعلبة অর্থাৎ, সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস! সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস! সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস!

ঘটনাক্রমে সে সময়েই সদ্‌কার আয়াত নাযিল হয়, যাতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে মুসলমানদের কাছ থেকে সদ্‌কা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়। خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً তিনি পালিত পশুর সদকার যথাযথ আইন প্রণয়ন করিয়ে দুজন লোককে সদকা উসুলকারী বানিয়ে মুসলমানদের পালিত পশুর সদকা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যেন তারা সা'লাবাহ্র কাছে যান। এছাড়া বনী সুলাইমের আরো এক লোকের কাছে যাবার হুকুমও করলেন।

এরা উভয়ে যখন সা'লাবাহ্র কাছে গিয়ে পৌঁছাল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর লিখিত ফরমান দেখাল, তখন সা'লাবাহ্ বলতে লাগল, এ তো 'জিযিয়া' কর হয়ে গেল, যা অ-মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। তারপর বলল, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এখানে হয়ে যাবেন। এঁরা চলে গেলেন।

আর সুলাইম গোত্রের অপর লোকটি যখন মহানবী (সাঃ)-এর ফরমান শুনল, তখন নিজের পালিত পশু উট-বকরীসমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল তা থেকে সদকার নেসাব অনুযায়ী সে পশু নিয়ে স্বয়ং রসূল (সাঃ)-এর সে দুই কর্মকর্তার কাছে হাযির হলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের প্রতি যে নির্দেশ রয়েছে, পশুসমূহের মধ্যে যেটি উৎকৃষ্ট সেটি যেন না নেই। কাজেই আমরা তো এগুলো নিতে পারি না। সুলাইমী লোকটি বার বার বিনয় করে বললেন, আমি নিজের খুশীতে এগুলো দিতে চাই; আপনারা দয়া করে কবুল করে নিন।

অতঃপর এ দুই কর্মকর্তা অন্যান্য মুসলমানদের সদকা আদায় করে সা'লাবাহ্র কাছে এলে সে বলল, দাও দেখি সদকার আইনগুলো আমাকে দেখাও। তারপর তা দেখে সে কথাই বলতে লাগল যে, এ তো এক রকম জিযিয়া করই হয়ে গেল যা মুসলমানদের কাছ থেকে নেয়া উচিত নয়। যাহোক, এখন আপনারা যান, আমি পরে চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নেব।

যখন এরা মদীনায় ফিরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন, তখন তিনি তাদের কুশল জিজ্ঞেস করার পূর্বে আবার সে বাক্যটিই পুনরাবৃত্তি করলেন, যা পূর্বে বলেছিলেন। يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة সা'লাবাহ্র উপর আফসোস!) কথাটি তিন তিন বার বললেন। তারপর সুলাইমীর ব্যাপারে খুশী হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এ ঘটনারই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কোন কোন লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা করেছিল যে, আল্লাহ্ যদি তাদের ধন-সম্পদ দান করেন, তবে তারা দান-খয়রাত করবে এবং উম্মতের সৎকর্মশীলদের মত সমস্ত হকদার, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-মিসকীনের প্রাপ্য আদায় করবে। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন, তখন কার্পণ্য করতে আরম্ভ করেছে এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যে বিমুখ হয়ে গেছে।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তাদের অপকর্ম ও অঙ্গীকার লংঘনের ফলে তাদের অন্তরসমূহে মুনাফেকী বা কুটিলতাকে আরো পাকাপোক্ত করে বসিয়ে দেন, যাতে তাদের তওবা করার ভাগ্যও হবে না।

হযরত আবু উমামাহ্ (রাঃ)-এর বিস্তারিত রেওয়ায়েতের পর— যা এইমাত্র উল্লেখ করা হল, ইবনে জরীর লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সা'লাবাহ্র জন্য তিন তিন বার আফসোস করেন তখন সে মজলিসে সা'লাবার কতিপয় আত্মীয়-আপনজনও উপস্থিত ছিল। হুযূর (সাঃ)-এর

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً
فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ
خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ
حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا
جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ
مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا
وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ
فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ
اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا
وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ
اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾
وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ
اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

(৮০) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্কে এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ না-ফরমানদেরকে পথ দেখান না। (৮১) পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্র রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনাশক্তি থাকত। (৮২) অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদবে। (৮৩) বস্তুতঃ আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোন শ্রেণীবিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং অতঃপর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে, তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ করেছ, কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক। (৮৪) আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ্র প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রসূলের প্রতিও। বস্তুতঃ তারা না-ফরমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে। (৮৫) আর বিস্মিত হয়ো না তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দরুন। আল্লাহ্ তো এই চান যে, এ সবের কারণে তাদেরকে আযাবের ভেতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত যেন তারা কাফেরই থাকে। (৮৬) আর যখন নাযিল হয় কোন সূরা যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র উপর, তাঁর রসূলের সাথে একাত্ম হয়ে; তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা এবং বলে আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিষ্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি।

এ বাক্যটি শুনে তাদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে সা'লাবার কাছে গিয়ে পৌঁছল এবং তাকে ভৎর্সনা করে বলল, তোমার সম্পর্কে কোরআনে আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। এ কথা সা'লাবাহ্ শুনে ঘাবড়ে গেল এবং মদীনায় হাযির হয়ে নিবেদন করল, হুযুর আমার সদ্কা কবূল করে নিন। নবী করীম (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তোমার সদ্কা কবূল করতে বারণ করে দিয়েছেন। একথা শুনে সা'লাবাহ্ নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল।

হুযুর (সাঃ) বললেন, এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্ম। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম, কিন্তু তুমি তা মান্য করনি। এখন আর তোমার সদ্কা কবূল হতে পারে না। তখন সা'লাবাহ্ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল এবং এর কিছুদিন পরই মহানবী (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ) খলীফা হলে সা'লাবাহ্ সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তার সদ্কা কবূল করার আবেদন জানাল। তিনি উত্তর দিলেন,যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ই কবুল করেননি, তখন আমি কেমন করে কবূল করব!

তারপর হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রাঃ)-এর ওফাতের পর সা'লাবাহ্ ফারূকে আযম (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয় এবং সে আবেদন জানায় এবং একই উত্তর পায়, যা সিদ্দীকে-আকবর (রাঃ) দিয়েছিলেন। এরপর হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফত আমলেও সে এ নিবেদন করে। কিন্তু তিনিও অস্বীকার করেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালেই সা'লাবার মৃত্যু হয়। - (মাযহারী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে উপর থেকেই মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, যারা সাধারণ নির্দেশ আসার পরেও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। আলোচ্য আয়াতগুলোতেও তাদেরই এক বিশেষ অবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং এ কারণে তাদের প্রতি আখেরাতের শাস্তি, দুনিয়াতে ভবিষ্যতের জন্য তাদের নাম মুজাহেদীনের তালিকা থেকে কেটে দেয়া এবং পরবর্তী কোন জেহাদে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে না দেয়ার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

مخلفون শব্দটি مخلف এর বহুবচন। অর্থ-'পরিত্যক্ত'। অর্থাৎ, যাকে পরিহার করা বা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা নিজেরা একথা মনে করে আনন্দিত হচ্ছে যে, আমরা নিজেদেরকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিতে পেরেছি এবং জেহাদে শামিল হতে হয়নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এহেন সম্মান পাবার যোগ্য মনে করেননি। কাজেই এরা জেহাদ 'বর্জনকারী' নয়; বরং জেহাদ থেকে 'বর্জিত'। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ই তাদেরকে বর্জনযোগ্য মনে করেছেন।

خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ এতে خلاف অর্থাৎ, 'পেছনে' বা 'পরে'। আবু ওবায়দা (রাঃ) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাতে এর মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, এরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জেহাদে চলে যাবার পর তাঁর পেছনে রয়ে যেতে পারল বলে আনন্দিত হচ্ছে যা বাস্তবিকপক্ষে আনন্দের বিষয়ই নয়। بِمَقْعَدِهِمْ শব্দটি এখানে قعود (বসে থাকা) এর ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থে এক্ষেত্রে خلاف অর্থ مخالفت তথা বিরোধিতাও হতে পারে। অর্থাৎ, এরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করে

ঘরে বসে রইল। আর শুধু নিজেরাই বসে রইল না; বরং অন্যান্য লোকদেরকেও এ কথাই বোঝাল যে, لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ অর্থাৎ, (এমন) গরমের সময়ে জেহাদে বেরিয়ো না।

একথা পূর্বেই জানা গেছে যে, তাবুক যুদ্ধের অভিযান এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাদের এ কথার উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেছেন قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا অর্থাৎ, এই হতভাগারা এ সময়ের উত্তাপ তো দেখছে এবং তা থেকে বাঁচার চিন্তা করছে। বস্তুতঃ এর ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের না-ফরমানীর দরুন যে জাহান্নামের আগুনের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা ভাবছেই না। তাহলে কি মওসুমের এ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপ অপেক্ষা বেশী? অতঃপর বলেন –

... فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا এর শাব্দিক অর্থ এই যে, 'হাসো কম, কাঁদো বেশী'। শব্দটি যদিও নির্দেশবাচক পদ আকারে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তফসীরবিদ মনীষীবৃন্দ একে সংবাদবাচক সাব্যস্ত করেছেন এবং নির্দেশবাচক পদ ব্যবহারের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে, এমনি ঘটা অবধারিত ও নিশ্চিত। অর্থাৎ, নিশ্চিতই এমনটি ঘটবে যে, তাদের এ আনন্দ ও হাসি হবে অতি সাময়িক। এরপর আখেরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে। এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আবী হাতেম (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا فاذا انقطعت الدنيا وصاروا الى الله فليستأنفوا البكاء لاينقطع ابدا "দুনিয়া সামান্য কয়েক–দিনের অবস্থানস্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। অতঃপর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু হবে যা আর নিবৃত্ত হবে না।" — (মাযহারী)

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে لَنْ تَخْرُجُوا এর মর্মার্থ এই যে, এরা যদি ভবিষ্যতে কোন জেহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, সেহেতু এদের সে ইচ্ছাও নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না; যখন রওয়ানা হবার সময় হবে, পূর্বেকার মতই নানা রকম ছলছুতার আশ্রয় নেবে। সুতরাং মহানবী (সাঃ)–এর প্রতি নির্দেশ হল যে, তারা নিজেরাও যখন কোন জেহাদে অংশগ্রহণের কথা বলবে, তখন আপনি প্রকৃত বিষয়টি তাদেরকে বাতলে দিন যে, তোমাদের কোন কথা বা কাজে বিশ্বাস নেই। তোমরা না যাবে জেহাদে, না আমার পক্ষ হয়ে ইসলামের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ হুকুমটি তাদের জন্য পার্থিব শাস্তি হিসাবে প্রবর্তন করা হয় যে, সত্যিকারভাবে তারা কোন জেহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও যেন তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া না হয়।

গোটা উম্মতের ঐকমত্যে আলোচ্য সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে যে, আলোচ্য ৮৪ তম এ আয়াতটি মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু ও তার জানাযা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সহীহাইন (অর্থাৎ, বোখারী ও মুসলিম)–এর রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তার জানাযায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামায পড়েন। নামায পড়ার পরই এ আয়াত নাযিল হয় এবং এরপর আর কখনো তিনি কোন মুনাফিকের জানাযার নামায পড়েননি।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)–এর বর্ণনায় এ আয়াত নাযিলের ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে। তা'হল এই যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালূল যখন মারা যায়, তখন তার পুত্র আবদুল্লাহ্ যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী ছিলেন হুযূর (সাঃ)–এর নিকট এসে নিবেদন করলেন যে, হুযূর, আপনি আপনার জামাটি দান করুন যাতে আমি তা আমার পিতার কাফনে পরাতে পারি। রসূলে করীম (সাঃ) নিজের জামা মোবারক দিয়ে দিলেন। তারপর আবদুল্লাহ্ নিবেদন করেন যে, আপনি তার জানাযার নামাযও পড়াবেন। হুযূর (সাঃ) তাও কবুল করেন। জানাযার নামাযে দাঁড়ালে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হুযূর (সাঃ)–এর কাপড় আকর্ষণ করে নিবেদন করলেন, আপনি এ মুনাফিকের জানাযা পড়ছেন, অথচ আল্লাহ্ আপনাকে মুসাফিকের নামায পড়তে বারণ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ আমাকে এ ব্যাপারে এখতিয়ার দিয়েছেন—মাগফেরাতের দোয়া করব অথবা করব না। আর সে আয়াতে যাতে সত্তর বার মাগফেরাতের দোয়া করলেও ক্ষমা হবে না বলে উল্লেখ রয়েছে, তা আমি সত্তর বারের বেশীও ইস্তেগফার করতে পারি। সে আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল সূরা তওবার ঐ আয়াত যা এইমাত্র বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার জানাযার নামায পড়েন এবং নামাযের পরেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ ..... (সুতরাং এরপর কখনও তিনি কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি।)

উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠে এই যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এমন এক মুনাফিক ছিল যার মুনাফিকী বিভিন্ন সময়ে প্রকাশও পেয়েছিল এবং সে ছিল সব মুনাফিকের সর্দার। কাজেই এর সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার করলেন কেমন করে যে, তার কাফনের জন্য নিজের পবিত্র জামা মোবারক পর্যন্ত দিয়ে দিলেন।

উত্তর এই যে, এর দু'টি কারণ থাকতে পারে ঃ (এক) তার পুত্র যিনি একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন তাঁর আবেদন। অর্থাৎ, শুধুমাত্র তাঁর মনস্তুষ্টির জন্যই তিনি এমনটি করেছিলেন। (দুই) অপর একটি কারণ এও হতে পারে, যা বুখারীর হাদীসে হযরত জাবের (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গযওয়ায়ে বদরের সময় যখন কিছু কোরাইশ সর্দার বন্দী হয়ে আসে, তাদের মধ্যে মহানবী (সাঃ)–এর চাচা আব্বাসও ছিলেন। হুযূর (সাঃ) দেখলেন, তাঁর গায়ে কোর্তা নেই। তখন সাহাবীদিগকে বললেন, তাকে একটি কোর্তা পরিয়ে দেয়া হোক। হযরত আব্বাস ছিলেন দীর্ঘদেহী লোক। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছাড়া অন্য কারো কোর্তা তাঁর গায়ে ঠিক মত লাগছিল না। ফলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর কোর্তা বা কামীস নিয়েই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের চাচা আব্বাসকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তার সে এহ্সানের বদলা হিসাবেই মহানবী (সাঃ) নিজের জামা মোবারকখানা তাকে দিয়ে দেন। (কুরতুবী)

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ এখানে আরো একটি প্রশ্ন এই যে, ফারূকে আযম (রাঃ) যে মহানবী (সাঃ)–কে বললেন যে, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে মুনাফিকদের নামায পড়তে বারণ করেছেন, তা কিসের ভিত্তিতে বলেছিলেন? কারণ, ইতিপূর্বে কোন আয়াতে পরিষ্কারভাবে তাঁকে মুনাফিকের জানাযা পড়তে বারণ করা হয়নি। এতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওমর বারণের বিষয়টি উক্ত সূরা তওবার সাবেক আয়াত اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ ..... । থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে আবারো প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ আয়াতটি যদি জানাযার নামাযের বারণের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে, তবে মহানবী (সাঃ) এতে বারণ হওয়া সাব্যস্ত করলেন না

কেন? বরং তিনি বললেন যে, এ আয়াতে আমাকে অধিকার দেয়া হয়েছে।

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে আয়াতের শব্দাবলীর বাহ্যিক মর্ম হচ্ছে এখতিয়ার দান। তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, সত্তর বারের উল্লেখ নির্দিষ্টতা বোঝাবার জন্য নয়, বরং আধিক্য বোঝাবার জন্য। সুতরাং উক্ত আয়াতের সারমর্ম এর বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী এই হবে যে, মুনাফিকদের মাগফেরাত হবে না, যতবারই তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন। কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হুযূরকে বারণ করা হয়নি। কোরআন করীমের অপর এক আয়াতে যা সূরা ইয়াসীনে উক্ত হয়েছে তাতে এর উদাহরণও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে —

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)–কে দ্বীনের তবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনে বারণ করা হয়নি, বরং অন্যান্য আয়াতের দ্বারা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ তাদের জন্যও অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয় – بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ অথবা إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ প্রভৃতি।

সারকথা এই যে, ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ আয়াতের দ্বারা তো মহানবী (সাঃ)–কে ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছেই, তদুপরি বর্তমান আলোচ্য আয়াতে নির্দিষ্ট দলীলের মাধ্যমে ভীতি-প্রদর্শনের ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয়ে গেল। মহানবী (সাঃ) উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে একথা বুঝে নিতে পেরেছিলেন যে, তাদের মাগফেরাত হবে না। কিন্তু অপর কোন আয়াতের মাধ্যমে এ পর্যন্ত তাঁকে ভীতি-প্রদর্শনেও বাধা দেয়া হয়নি।

আর মহানবী (সাঃ) জানতেন যে, তার জামার কারণে কিংবা জানাযা পড়ার দরুন তার মাগফেরাত হবে না, কিন্তু এতে অন্যান্য দ্বীনী কল্যাণ সাধিত হওয়ার আশা করা যায়। এতে হয়তো তার পরিবারের লোক ও অন্যান্য কাফেররা যখন হুযূর (সাঃ)–এর এহেন সৌজন্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করবে, তখন তারাও ইসলামের নিকটবর্তী হবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে। তাছাড়া তখনো পর্যন্ত যেহেতু (মুনাফেকের) জানাযা পড়ার সরাসরি নিষেধাজ্ঞা ছিল না, সেহেতু তিনি তার জানাযা পড়েছেন।

এ উত্তরের সমর্থন হয়তো সহীহ বুখারীর বাক্যেও পাওয়া যাবে, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যদি জানতে পারতাম, সত্তর বারের বেশী দোয়া ও মাগফেরাত কামনায় তার মাগফেরাত হয়ে যাবে, তাহলে আমি তাও করতাম।— (কুরতুবী)

দ্বিতীয় প্রমাণ হল, সে হাদীস যাতে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আমার জামা তাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে আমি এ কাজটি এ জন্য করেছি যে, আমার আশা, এ কাজের ফলে তার সম্প্রদায়ের হাজারো লোক মুসলমান হয়ে যাবে। সুতরাং মাগাযী এবং কোন কোন তফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে, এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খাযরাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান হয়ে যায়।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মাধ্যমে স্বয়ং হুযূর (সাঃ)– এরও এ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, তার এ কাজের দরুন এই মুনাফেকের মাগফেরাত তথা পাপ মুক্তি হবে না, কিন্তু যেহেতু আয়াতের শব্দাবলীতে বাহ্যতঃ এই অধিকার দেয়া হয়েছিল; অন্য কোন আয়াতের মাধ্যমে নিষেধও করা হয়নি এবং যেহেতু অপর দিকে একজন কাফেরের প্রতি ইহসান করার মধ্যে পৃথিবীর কল্যাণের আশাও বিদ্যমান ছিল এবং এ ব্যবহারের দ্বারাও অন্যান্য কাফেরদের মুসলমান হওয়ার আশা ছিল, কাজেই তিনি নামায পড়াকেই অগ্রাধিকার দান করেছিলেন। আর ফারূকে আ'যম (রাঃ) বুঝেছিলেন যে, এ আয়াতের দ্বারা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মাগফেরাত হবে না, তখন তার জন্য নামাযে জানাযা পড়ে মাগফেরাত প্রার্থনা করাটা একটা অহেতুক কাজ, যা নবুওয়তের শানের খেলাফ। আর একেই তিনি নিষেধাজ্ঞা হিসাবে প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে রসূলে মকবুল (সাঃ) যদিও এ কাজটিকে মূলতঃ কল্যাণকর মনে করতেন না, কিন্তু অন্যান্যদের ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হওয়ার প্রেক্ষিতে তা অহেতুক ছিল না। এভাবে না রসূলে করীম (সাঃ)–এর কাজের উপর কোন আপত্তি থাকে, না ফারূকে আ'যম (রাঃ–এর কথায় কোন প্রশ্ন উঠতে পারে।– (বয়ানুল – কোরআন)

মাসআলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন কাফেরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশে তার সমাধিতে দাঁড়ানো কিংবা তা যেয়ারত করতে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য অথবা কোন বাধ্যবাধকতার কারণে হলে তা এর পরিপন্থী নয়। যেমন হেদায়া গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি কোন মুসলমানের কোন কাফের আত্মীয় মারা যায় এবং তার কোন ওলী–ওয়ারিস না থাকে, তবে মুসলমান অত্মীয় সুন্নত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না করে তাকে সাধারণভাবে মাটিতে পুঁততে পারে।—(বয়ানুল – কোরআন)

উল্লেখিত আয়াতগুলোতেও সেসব মুনাফেকের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে বিরত থেকে ছিল। সেসব মুনাফেকের মাঝে কেউ কেউ সম্পদশালী লোকও ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলমানদের ধারণা হতে পারত যে, এরা যখন আল্লাহ্‌র নিকট ধিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নেয়ামত পাবে?

এর উত্তরে ৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, তাদের এ ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি কোন রহমত ও নেয়ামত নয়; বরং পার্থিবজীবনেও এগুলো তাদের জন্য আযাববিশেষ। আখেরাতের আযাব তো এর বাইরে আছেই। দুনিয়াতে আযাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধন–সম্পদের মহব্বত, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির চিন্তা–ভাবনা তাদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে যে, কোন সময় কোন অবস্থাতেই স্বস্তি পেতে দেয় না। আরাম–আয়েশের যত উপকরণই তাদের কাছে থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম জুটে না যা মনের শান্তি ও স্বস্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া দুনিয়ার এসব ধন–সম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখেরাত সম্পর্কে গাফেল করে দিয়ে কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আযাবের কারণ হিসাবেও এগুলোকে আযাব বলা যেতে পারে। এ কারণেই কোরআনের ভাষায় لِيُعَذِّبَهُم بِهَا বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এ সমস্ত ধন–সম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান।

أُولُو الطَّوْلِ শব্দটি সম্পন্ন লোকদের নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং এর দ্বারা যারা সম্পন্ন নয় অর্থাৎ, যারা অসম্পন্ন এতে তাদের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, তাদের কাছে একটা বাহ্যিক ওযরও ছিল (যার ভিত্তিতে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে অব্যাহতি কামনা করতে পারত)।

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۚ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾ وَ
جَاۗءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ
كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاۗءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا
عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَ
رَسُوْلِهٖ ۭ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾
وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ
مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۡ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ
حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ
يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاۗءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا
مَعَ الْخَوَالِفِ ۚ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

(৮৭) তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুতঃ তারা বোঝে না। (৮৮) কিন্তু রসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তাঁর সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মালের দ্বারা। তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। (৮৯) আল্লাহ্ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তারা তাতে বাস করবে অনন্তকাল। এটাই হল বিরাট কৃতকার্যতা। (৯০) আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই যারা আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। এবার তাদের উপর শীগ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফের। (৯১) দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (৯২) আর না আছে তাদের উপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতেছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে। (৯৩) অভিযোগের পথ তো তাদের ব্যাপারে রয়েছে, যারা তোমার নিকট অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা সম্পদশালী। যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ্ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে। বস্তুতঃ তারা জানতেও পারেনি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এসব বেদুইন যাযাবরদের মধ্যে দু'রকম লোক ছিল। (এক) যারা ছল-ছুতা পেশ করার জন্য মহানবী (সাঃ)- এর খেদমতে হাযির হয় যাতে তাদেরকে জেহাদে যাওয়ার ব্যাপারে অব্যাহতি দান করা হয়। আর কিছু লোক ছিল এমন উদ্ধত যারা অব্যাহতি লাভের তোয়াক্কা না করেই নিজ নিজ অবস্থানে নিজের মতেই বসে থাকে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন জাদ্দ ইবনে কায়েসকে জেহাদে না যাবার অনুমতি দিয়ে দেন, তখন কতিপয় মুনাফেকও খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু কিছু ছল-ছুতা পেশ করে জেহাদ বর্জনের অনুমতি প্রার্থনা করে। এতে তিনি অনুমতি অবশ্য দিয়ে দেন, কিন্তু একথাও বুঝতে পারেন যে, এরা মিথ্যা ওযর পেশ করছে। কাজেই তাদের ব্যাপারে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য এরই সঙ্গে مِنْهُمْ كَفَرُوْا বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এদের মধ্যে কারো কারো ওযর কুফরী ও মুনাফেকীর কারণে ছিল না; বরং স্বভাবগত আলস্যের কারণে ছিল। এরা এই কাফেরদের আযাবের আওতাভুক্ত নয়।

বিগত আয়াতসমূহে এমনসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যারা প্রকৃতপক্ষে জেহাদে অংশগ্রহণে অপারগ ছিল না, কিন্তু শৈথিল্যবশতঃ অজুহাত দর্শিয়ে তা থেকে বিরত রয়েছে কিংবা এমন সব মুনাফেকরা বিরত থেকেছে, যারা নিজেদের কুফরী ও কুটিলতা হেতু নানা রকম ছলছুতার আশ্রয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিয়েছিল। তাছাড়া এতে এমন কিছু উদ্ধত লোকও ছিল যারা অজুহাত দর্শিয়েও অনুমতি গ্রহণের কোন প্রয়োজনবোধ করেনি, এমনিতেই বিরত থেকে গেছে। এদের অপারগ না হওয়া এবং তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে লিপ্ত ছিল, তাদের বেদনাদায়ক আযাব হওয়ার ব্যাপারটি বিগত আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে।

উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহে যে সমস্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, যারা প্রকৃতই অপরাগতার দরুন জেহাদে অংশ গ্রহণে অসমর্থ ছিল। এদের মধ্যে কিছু লোক ছিল অন্ধ বা অসুস্থতার কারণে অপারগ এবং যাদের অপারগতা ছিল একান্ত সুস্পষ্ট। আর কিছু লোক ছিল যারা জেহাদে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল, বরং জেহাদে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, কিন্তু তাদের কাছে সফর করার জন্য সওয়ারীর কোন জীব ছিল না। বস্তুতঃ সফর ছিল সুদীর্ঘ এবং মওসুমটি ছিল গরমের। তারা নিজেদের জেহাদী উদ্দীপনা এবং সওয়ারীর অভাবে তাতে অংশগ্রহণে অপরাগতার কথা জানিয়ে রসূলে করীম (সাঃ) – এর নিকট আবেদন করে যে, আমাদের জন্য সওয়ারীর কোন ব্যবস্থা করা হোক।

তফসীরের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের একাধিক ঘটনার কথা লেখা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, প্রথমে রসূলে করীম (সাঃ) তাদের কাছে নিজের অপারগতা জানিয়ে দেন যে, আমাদের কাছে সওয়ারী বা যানবাহনের কোন ব্যবস্থ নেই। তাতে তারা অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ফিরে যায় এবং কেঁদেই সময় কাটাতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য এ ব্যবস্থা করেন যে, তখনই হুযূর (সাঃ) – এর নিকট ছয়টি উট এসে যায় এবং তিনি সেগুলো তাদের দিয়ে দেন।—(মাযহারী) তাদের মধ্যে তিন

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَّا
تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ۚ وَ
سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ
لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ
اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۚ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾
يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ
لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٦﴾ اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ
نِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى
رَسُوْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ
مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ۚ عَلَيْهِمْ
دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ
يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ
عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ۚ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ
سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾

(৯৪) তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট ছল-ছুতা নিয়ে উপস্থিত হবে; তুমি বলো, ছল কারো না, আমি কখনো তোমাদের কথা শুনব না; আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহ্ই দেখবেন এবং তাঁর রসূল। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও অগোপন বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনি-ই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। (৯৫) এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহ্র কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর– নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো দোযখ। (৯৬) তারা তোমার সামনে কসম খাবে যাতে তুমি তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও। অতএব, তুমি যদি রাযী হয়ে যাও তাদের প্রতি তবু আল্লাহ্ তা'আলা রাযী হবেন না, এ নাফরমান লোকদের প্রতি। (৯৭) বেদুইনরা কুফর ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলের উপর নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সব কিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী। (৯৮) আবার কোন কোন বেদুইন এমনও রয়েছে যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং তোমার উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই উপর দুর্দিন আসুক! আর আল্লাহ্ হচ্ছেন শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। (৯৯) আর কোন কোন বেদুইন হল তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র উপর, কেয়ামত দিনের উপর এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহ্র নৈকট্য এবং রসূলের দোয়া লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনো! তাই হল তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য। আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

জনের সওয়ারীর ব্যবস্থা করেন হযরত ওসমান গনী (রাঃ)। অথচ ইতিপূর্বে তিনি বিপুল পরিমাণ ব্যবস্থা নিজ খরচে করেছিলেন।

আবার অনেক এমন লোকও থেকে যায়, যাদের জন্য শেষ পর্যন্তও কোন সওয়ারীর ব্যবস্থা হয়নি এবং বাধ্য হয়ে তারা জেহাদে বিরত থাকে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাদের কথাই বলা হয়েছে যাদের অপরাগতা আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছেন। আয়াতের শেষাংশে এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, বিপদ শুধু তাদের ক্ষেত্রে যারা সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও জেহাদে অনুপস্থিত থাকাকে নারীদের মত পছন্দ করে নিয়েছে। إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ - এর মর্মও তাই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব মুনাফেকের আলোচনা ছিল যারা গযওয়ায়ে তাবুকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মিথ্যা অজুহাত দর্শিয়ে জেহাদে যাওয়া থেকে অপারগতা প্রকাশ করেছিল। উপরোল্লেখিত আয়াতগুলোতে আলোচনা করা হচ্ছে সেসব লোকদের, যারা জেহাদ থেকে ফিরে আসার পর রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের জেহাদে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মিথ্যা ওযর-আপত্তি পেশ করছিল। এ আয়াতগুলো মদীনায় তাইয়্যেবায় ফিরে আসার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে পরবর্তী সময়ে সংঘটিতব্য ঘটনার সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আপনি যখন মদীনায় ফিরে যাবেন, তখন মুনাফেকরা ওযর-আপত্তি নিয়ে আপনার নিকট আসবে। বস্তুতঃ ঘটনাও তাই ঘটে।

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তিনটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে—(এক) যখন এরা আপনার কাছে ওযর-আপত্তি পেশ করার জন্য আসে, আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, খামাখা মিথ্যা ওযর পেশ করো না। আমরা তোমাদের কথাকে সত্য বলে স্বীকার করব না। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে তোমাদের দুষ্টামী এবং তোমাদের মনের গোপন ইচ্ছা প্রভৃতি সবই বাতলে দিয়েছেন। ফলে তোমাদের মিথ্যাবাদিতা আমাদের কাছে প্রকৃষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কোন রকম ওযর-আপত্তি বর্ণনা করা অর্থহীন। তারপর বলা হয়েছে— وَ سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ এতে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে, এখনও যেন তারা মুনাফেকী পরিহার করে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যায়। কারণ, এতে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন যে, তা কি এবং কোন্ ধরনের হয়। যদি তোমরা তওবা করে নিয়ে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যাও, তবে সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হবে; তোমাদের পাপ মাফ হয়ে যাবে। অন্যথায় তা তোমাদের কোন উপরকারই সাধন করবে না।

(দুই) ৯৫ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এসব লোক আপনার ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাইবে এবং তাতে তাদের উদ্দেশ্য হবে, لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ অর্থাৎ, আপনি যেন তাদের জেহাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উপেক্ষা করেন এবং সেজন্য যেন কোন ভর্ৎসনা না করেন। এরই প্রেক্ষিতে এরশাদ হয়েছে যে, আপনি তাদের এই বাসনা পূরণ করে দিন। فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ অর্থাৎ, আপনি তাদের বিষয় উপেক্ষা করুন। তাদের প্রতি ভৎসনাও করবেন না কিংবা তাদের সাথে উৎফুল্ল সম্পর্কও রাখবেন না। কারণ, ভর্ৎসনা করে কোন ফায়দা নেই। তাদের মনে যখন ঈমান নেই এবং তার বাসনাও নেই, তখন ভর্ৎসনা করেই

কি হবে। খামাখা কেন নিজের সময় নষ্ট করা।

(তিন) ৯৬ নং আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এরা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে এবং মুসলমানদেরকে রাযী করাতে চাইবে। এ ব্যাপারের আল্লাহ্ তাআলা হেদায়েত দান করেছেন যে, তাদের প্রতি রাযী হবেন না। সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, আপনি রাযী হয়ে গেলেন বলে যদি ধরেও নেয়া যায়, তবুও তাতে তাদের কোন লাভ হবে না এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাযী নন। তাছাড়াও তারা যখন নিজেদের কুফরী ও মুনাফেকীর উপরই অটল থাকল, তখন আল্লাহ্ তাআলা কেমন করে রাযী হবেন!

اعراب শব্দটি عرب শব্দের বহুবচন নয়; বরং এটি একটি পদ বিশেষ যা শহরের বাইরের অধিবাসীদের বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর একক করতে হলে اعرابى বলা হয়। যেমন, انصار – এর এক বচন, انصارى হয়ে থাকে।

তাদের অবস্থা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, এরা কুফরী ও মুনাফেকীর ব্যাপারে শহরবাসী অপেক্ষাও বেশী কঠোর। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এরা এলম ও আলেম তথা জ্ঞান ও জ্ঞানী লোকদের থেকে দূরে থাকার কারণে মূর্খতা, কঠোরতায় ভুগতে থাকার দরুন মনের দিক দিয়েও কঠোর হয়ে পড়ে। وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ অর্থাৎ, এসব লোকের পরিবেশই অনেকটা এমন যে, এরা আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। কারণ, না কোরআন তাদের সামনে আসে, না তার অর্থ-মর্ম ও বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

৯৮ নং আয়াতেও এ সমস্ত বেদুইনেরই একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা যাকাত প্রভৃতিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে এক প্রকার জরিমানা বলে মনে করে। তার কারণ, তাদের অন্তরে তো ঈমান নেই, শুধু নিজেদের কুফরীকে লুকাবার জন্য নামাযও পড়ে নেয় এবং করয যাকাতও দিয়ে দেয়। কিন্তু মনে এ কালিমা থেকেই যায় যে, এ অর্থ অনর্থক খরচ হয়ে গেল। আর সেজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, কোন রকমে মুসলমানদের উপর কোন বিপদ নেমে আসুক এবং তারা পরাজিত হয়ে যাক; তাহলেই আমাদের এহেন অর্থদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ হবে। الدَّوَائِرَ শব্দটি دائرة – এর বহুবচন। আরবী অভিধান অনুযায়ী دائرة (দায়েরাহ্) এমন পরিবর্তনশীল অবস্থাকে বলা হয়, যাতে প্রথম ভাল অবস্থার পর মন্দে পরিণত হয়ে যায়। সেজন্যই কোরআন করীম তাদের উত্তরে বলেছে عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ অর্থাৎ, তাদেরই উপর মন্দ অবস্থা আসবে। আর এরা নিজেদের সেসব কাজ-কর্ম ও কথাবার্তার কারণে অধিকতর অপমানিত।

বেদুইন মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনার কোরআনী বর্ণনারীতি অনুযায়ী তৃতীয় আয়াতে সেসব বেদুইনের আলোচনা সংগত মনে করা হয়েছে যারা সত্যিকার ও পাকা মুসলমান। আর তা এজন্য যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, সব বেদুইনই এক রকম নয়। তাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক আছে। তাদের অবস্থা হল এই যে, তারা যে সদকা-যাকাত দেয়, তাকে তারা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দোয়াপ্রাপ্তির আশায় দিয়ে থাকে।

সদ্কা যে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় তা সুস্পষ্ট। তবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দোয়া লাভের আশা এভাবে যে, কোরআন-করীমে যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাতের মালামাল আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, যাকাত দানকারীদের জন্য আপনি দোয়াও করতে থাকুন। যেমন, পরবর্তী এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে – خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সদকা উসূল করার সাথে সাথে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের জন্য দোয়াও করুন। এ নির্দেশটি এসেছে صلوة শব্দের মাধ্যমে। বলা হয়েছে, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ কারণেই উল্লেখিত আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর দোয়াকে صلوة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَمِنْ
اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۫ لَا تَعْلَمُهُمْ ۗ نَحْنُ
نَعْلَمُهُمْ ۗ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠١﴾
وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ۗ
عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠٢﴾ خُذْ
مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ
اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَ
اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾ وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾ وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ
لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

(১০০) আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। (১০১) আর কিছু কিছু তোমার আশ-পাশের মুনাফেক এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফেকীতে অনড়। তুমি তাদের জান না; আমি তাদের জানি। আমি তাদেরকে আযাব দান করব দু' বার, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহান আযাবের দিকে। (১০২) আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১০৩) তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন, জানেন। (১০৪) তারা কি একথা জানতে পারেনি যে, আল্লাহ্ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং যাকাত গ্রহণ করেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ই তওবা কবুলকারী, করুণাময়। (১০৫) আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ্ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রসূল ও মুসলমানগণ। তাছাড়া তোমরা শীঘ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদেরকে যা করতে। (১০৬) আবার অনেক লোক রয়েছে যাদের কাজকর্ম আল্লাহ্র নির্দেশের উপর স্থগিত রয়েছে; তিনি হয় তাদের আযাব দেবেন না হয় তাদের ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সব কিছুই জ্ঞাত, বিজ্ঞতাসম্পন্ন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ বাক্যটিতে ব্যবহৃত مِن অব্যয়কে অধিকাংশ তফসীরবিদগণ تبعيض – এর জন্য সাব্যস্ত করে মুহাজেরীন ও আনসারদের দু' টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (১) ঈমান গ্রহণে ও হিজরতে যারা অগ্রবর্তী এবং (২) অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম।

এমন করার ক্ষেত্রেও মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন মনীষী সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে سابقين اولين তাদেরকেই সাব্যস্ত করেছেন, যারা উভয় কেবলা (অর্থাৎ, বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ্) এর দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। অর্থাৎ, যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে মুসলমান হয়েছেন তাঁদেরকে سابقين اولين গণ্য করেছেন। এমনটি হল সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব ও কাতাদাহ্ (রাঃ)–এর। হযরত আ'তা ইবনে আবী রাবাহ্ বলেছেন যে, 'সাবেকীনে আওয়ালীন' হলেন সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম যাঁরা গযওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণ করেছেন। আর ইমাম শা'বী (রাঃ)-এর মতে যেসব সাহাবী হোদায়বিয়ার বাইআতে–রেদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাই 'সাবেকীনে আওয়ালীন'। বস্তুতঃ প্রতিটি মতানুযায়ী অন্যান্য সাহাবাগণ মুহাজির হোক বা আনসার–সাবেকীনে আওয়ালীনের পর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। (কুরতুবী, মাযহারী)

তফসীরে–মাযহারীতে আরো একটি মত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ আয়াতে مِن অব্যয়টি আংশিককে বোঝাবার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়নি, বরং বিবরণের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর মর্ম হবে এই যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম অন্যান্য সমস্ত উম্মতের তুলনায় সাবেকীনে আওয়ালীন। আর سابقين اولين হল তার বিবরণ। —'বয়ানুল–কোরআন' থেকে তফসীরের যে সার–সংক্ষেপ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতেও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম তফসীর অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের দু' টি শ্রেণী সাব্যস্ত হয়েছে। একটি হল সাবেকীনে আওয়ালীনের, আর দ্বিতীয়টি কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইআতে রেদওয়ানের পরে যারা মুসলমান হয়েছেন তাঁদের; আর দ্বিতীয় তফসীরের মর্ম হল এই যে, সাহাবায়ে কেরামই হলেন মুসলমানদের মধ্যে সাবেকীনে আওয়ালীন। কারণ, ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাঁরাই সমগ্র উম্মতের অগ্রবর্তী ও প্রথম।

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ, যারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুসলমানদের অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণভাবে। প্রথম বাক্যের প্রথম তফসীর অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইআতে হোদায়বিয়ার পর মুসলমান হয়ে সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হল তাঁদের পরবর্তী সে সমস্ত মুসলমানদের, যারা কেয়ামত অবধি ঈমান গ্রহণ, সৎকর্ম ও সচ্চারিত্রিকতার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর চলবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে।

আর দ্বিতীয় তফসীর অনুযায়ী وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ বাক্যে সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে পরিভাষাগতভাবে تابعى (তাবেয়ী) বলা হয়। এরপর পরিভাষাগত এই তাবেয়ীগণের পর কেয়ামত অবধি আগত সে সমস্ত মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ঈমান ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে।

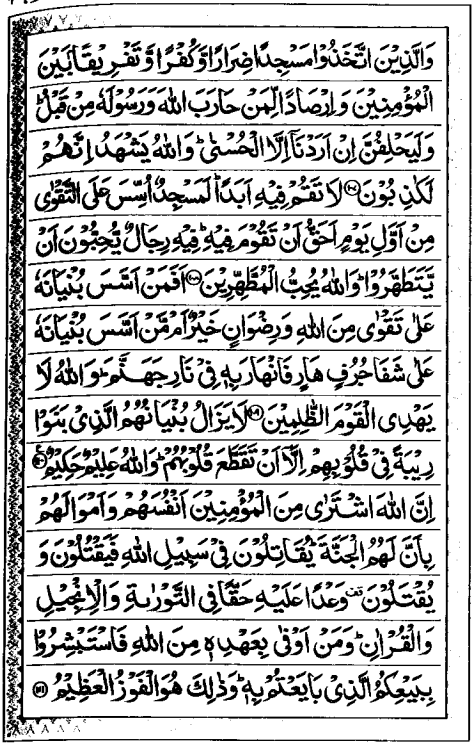

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ
وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ
مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن
يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ
عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ
عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا
رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ
يُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ
وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

(১০৭) আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাটিস্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক। (১০৮) তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ্ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। (১০৯) যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন গর্তের কিনারায় যা ধ্বসে পড়ার নিকটবর্তী এবং অতঃপর তা ওকে নিয়ে দোযখের আগুনে পতিত হয়। আর আল্লাহ্ জালেমদের পথ দেখান না। (১১০) তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে যে পর্যন্ত না তাদের অন্তরগুলো চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ-প্রজ্ঞাময়।(১১১) আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র রাহে: অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহ্‌র চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য

সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতী ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ঃ

মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কুরবী (রাঃ)-কে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সবাই জান্নাতবাসী হবেন— যদি দুনিয়াতে তাঁদের কারো দ্বারা কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। সে লোকটি জিজ্ঞেস করল, একথা আপনি কোত্থেকে বলছেন (এর প্রমাণ কি)? তিনি বললেন, কোরআন করীমের আয়াত পড়ে দেখ। وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ – এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত সাহাবা সম্পর্কেই বলা হয়েছে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে اتباع باحسان -এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের সবাই কোন রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিধন্য হবেন।

তফসীরে-মাযহারীতে এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, আমার মতে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে এর চাইতেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى আয়াতটি। এতে বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হন কি পরবর্তী পর্যায়ের, আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সবার জন্যই জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

তাছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক হাদীসে এরশাদ করেছেন যে, জাহান্নামের আগুন সে মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না, যে আমাকে দেখেছে কিংবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে।—(তিরমিযী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ যে দশ জন মুমিন বিনা ওজরে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন তাঁদের সাত জন মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ-অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের উল্লেখ রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا আয়াতে। বাকী তিন জনের হুকুম রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ আয়াতে, যারা প্রকাশ্যে এভাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেননি। রসূলে করীম (সাঃ) তাঁদের সমাজচ্যুত করার, এমনকি তাঁদের সাথে সালাম-দোয়ার আদান-প্রদান পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেয়ার পর তাদের অবস্থা শোধরে যায় এবং এখলাসের সাথে অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে নেন। ফলে তাদের জন্য ক্ষমার আদেশ দেয়া হয়।– (বোখারী, মুসলিম)।

মসজিদে যেরার ঃ মদীনায় আবু আ'মের নামের এক ব্যক্তি জাহেলী যুগে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে আবু আ'মের পাদ্রী নামে খ্যাত হলো। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হানযালা (রাঃ) যাঁর মরদেহকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও খ্রীষ্টবাদের উপর অবিচল ছিল।

হযরত নবী করীম (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হলে আবু আ'মের তাঁর সমীপে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। মহানবী (সাঃ) তার অভিযোগের জবাব দান করেন। কিন্তু

তাতে সেই হতভাগার সান্ত্বনা আসলো না। অধিকন্তু সে বলল, "আমরা দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সে একথাও বলল যে, আপনার যে কোন প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাবো। সে মতে হোনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলমানদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযেনের মত সুবৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ায় চলে গেল। কারণ, তখন এটি ছিল খ্রীষ্টানদের কেন্দ্রস্থল। আর সেখানে সে আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। সে যে দোয়া করেছিল, তা সে ভোগ করলো। আসলে লাঞ্ছনা ভোগ কারো অদৃষ্টে থাকলে সে এমনই করে এবং নিজের দোয়ায় নিজেই লাঞ্ছিত হয়।

তবে আজীবন সে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। সে রোম সম্রাটকে মদীনায় অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের উৎখাত করার প্ররোচনাও দিয়েছিল।

এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনার পরিচিত মুনাফেকদের কাছে চিঠি লিখে যে, "রোম সম্রাট কর্তৃক মদীনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথা সময় সম্রাটের সাহায্য হয় এমন কোন সম্মিলিত শক্তি তোমাদের থাকা চাই। এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদীনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যেন মুসলমানদের অন্তরে কোন সন্দেহ না আসে। অতঃপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ এবং পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর।"

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বার জন মুনাফেক মদীনার কোবা মহল্লায়, যেখানে হুযূরে আকরাম (সাঃ) হিজরত করে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন— আরেকটি মসজিদের ভিত্তি রাখল। ইবনে ইস্‌হাক (রহঃ) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এ বার জনের নাম উল্লেখ করেছেন। সে যাহোক অতঃপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশে সিদ্ধান্ত নিল যে, স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-এর দ্বারা এক ওয়াক্ত নামায সেখানে পড়াবে। এতে মুসলমানগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্মিত মসজিদের মত এটিও একটি মসজিদ।

এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করে যে, কোবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। এছাড়া মসজিদটি এত প্রশস্তও নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করেন, তবে আমরা বরকত লাভে ধন্য হব।

রসূলে করীম (সাঃ) তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন সফরের প্রস্তুতিতে আছি। ফিরে এসে নামায আদায় করব। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন মসজিদে যেরার সম্পর্কিত এই আয়াতগুলো নাযিল হয়। এতে মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া হল। আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রসূলে করীম (সাঃ) কতিপয় সাহাবীকে— যাদের মধ্যে আমের বিন সকস্ এবং হযরত হামযা (রাঃ)-এর হন্তা 'ওয়াহশী' ও উপস্থিত ছিলেন— এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। আদেশমতে তাঁরা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। এসব ঘটনা তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।

তফসীরে-মাযহারীতে ইউসুফ বিন সালেহীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) মদীনা পৌছে দেখেন যে, সে মসজিদের জায়গাটি ফাঁকা পড়ে আছে। তিনি আসেম বিন আ'দীকে সেখানে গৃহ নির্মাণের অনুমতি দান করেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, যে জায়গা সম্পর্কে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, সেই অভিশপ্ত স্থানে গৃহ নির্মাণ আমার পছন্দ নয়। তবে সাবেত বিন আকরামের ভোগদখলে জায়গাটি দিয়ে দিন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সে ঘরে তারও কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি কিংবা জীবিত থাকেনি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে জায়গায় মানুষ তো দূরের কথা, পাখীকুল পর্যন্ত ডিম ও বাচ্চা দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাই সেই থেকে আজ পর্যন্ত মসজিদে কোবা থেকে কিছু দূরত্বে অবস্থিত সে জায়গাটি বিরান পড়ে আছে।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا যারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশে মসজিদের নামে গৃহ নির্মাণ করেছে ওরাও মুনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতে উক্ত মসজিদ নির্মাণের তিনটি উদ্দেশ্য উল্লেখিত হয়েছে। প্রথমতঃ ضِرَارًا অর্থাৎ, মুসলমানদের ক্ষতিসাধন। ضرار ও ضرر শব্দের অর্থ ক্ষতিসাধন। তবে ভাষাবিদগণ এ শব্দ দু'টির মধ্যে কিছু পার্থক্য করেছেন। তারা বলেন, ضرر সেই ক্ষতিকে বলা হয়, যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষে হয় লাভজনক, আর তার প্রতিপক্ষের জন্য হয় ক্ষতিকারক, আর ضرر হলো যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষেও মঙ্গলজনক হয় না। যেহেতু উক্ত মসজিদ নির্মাতাদের মঙ্গলের পরিবর্তে মারাত্মক ضِرَارًا পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে, তাই আয়াতে ضرار শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, অপর মসজিদ নির্মাণ দ্বারা মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা। একটি দল সে মসজিদে নামায আদায়ের জন্য পৃথক হয়ে যাবে, যার ফলে কোবার পুরাতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস পাবে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য, وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ অর্থাৎ, সেখানে আল্লাহ্ ও রসূলের শত্রুদের আশ্রয় মিলবে এবং তারা বসে বসে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারবে।

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যে মসজিদকে কোরআন মজীদ 'মসজিদে যিরার' নামে অভিহিত করেছে এবং যাকে মহানবী (সাঃ)-এর আদেশে ধ্বংস ও ভস্ম করা হয়েছে তা মূলতঃ মসজিদই ছিল না, তা নামায আদায়ের জন্য নির্মিত হয়নি। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, যা কোরআন চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, বর্তমান যুগে কোন মসজিদের মোকাবেলায় তার কাছাকাছি অন্য মসজিদ নির্মাণ করা হলে এবং এর পেছনে যদি মুসলমানদের বিভক্তিকরণ ও পূর্বের মসজিদের মুসল্লী হ্রাস প্রভৃতি অসৎ নিয়ত থাকে, তবে এতে মসজিদ নির্মাতার সওয়াব তো হবেই না, বরং বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও শরীয়ত মতে সে জায়গাটিকে মসজিদই বলা হবে এবং মসজিদের আদব ও হুকুমগুলো এখানেও প্রযোজ্য হবে। একে ধ্বংস করা কিংবা আগুন লাগিয়ে ভস্ম করা জায়েয হবে না। এ ধরনের মসজিদ নির্মাণ মূলতঃ গুনাহের কাজ হলেও যারা এতে নামায আদায় করবে, তাদের নামাযকে অশুদ্ধ বলা যাবে না। এ থেকে অপর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেউ যদি জিদের বশে বা লোক দেখানোর উদ্দেশে

মসজিদ নির্মাণ করে, তবে যদিও মসজিদ নির্মাণের সওয়াব সে পেলো বরং গুনাহ্গার হবে; কিন্তু একে আয়াতে উল্লেখিত 'মসজিদে যিরার' বলা যাবে না। অনেকে এ ধরনের মসজিদকে 'মসজিদে যিরার' বলে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। তবে একে 'মসজিদে যিরার এর মত' বলা যায়। তাই এর নির্মাতাকে এ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত রাখা যেতে পারে। যেমন, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এক আদেশ জারী করেছিলেন যে, এক মসজিদের পার্শ্বে অন্য মসজিদ নির্মাণ করবে না, তাতে পূর্বতন মসজিদের জামাআত ও সৌন্দর্য হ্রাস পায়। – (কাশ্শাফ)

৩. উপরোক্ত 'মসজিদে যিরার' সম্পর্কে ১০৮ নং আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে হুকুম করা হয় যে, لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا এখানে দাঁড়ানো অর্থ নামাযের উদ্দেশে দাঁড়ানো। অর্থাৎ, আপনি এই তথাকথিত মসজিদে কখনো নামায আদায় করবেন না।

৪. এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, আপনার নামায যে মসজিদেই দুরস্ত হবে, যার ভিত্তি রাখা হয় প্রথমদিন থেকে তাকওয়া বা খোদাভীতির উপর। আর সেখানে এমন লোকেরা নামায আদায় করে, যারা পাকপবিত্রতায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে উদগ্রীব। বস্তুতঃ আল্লাহ্ নিজেও এমনিতর পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।

৫. আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে বোঝা যায় যে, প্রশংসিত সে মসজিদটি হলো মসজিদে কোবা, যেখানে মহানবী (সাঃ) তখন নামায আদায় করতেন। হাদীসের কতিপয় রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। (তফসীরে মাযহারী)

৬. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا এ আয়াতে সেই মসজিদকে মহানবী (সাঃ)-এর নামাযের অধিকতর হকদার বলে অভিহিত করা হয়, যার ভিত্তি শুরু থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে। সে হিসেবে মসজিদে কোবা ও মসজিদে নববী উভয়টিই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে মসজিদেরই ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তথাকার মুসল্লীগণ পাক-পবিত্রতা অর্জনে সবিশেষ যত্নবান। পাক-পবিত্রতা বলতে এখানে সাধারণ না-পাকী ও ময়লা থেকে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং তৎসঙ্গে গুনাহ্ ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র থাকা বোঝায়। আর মসজিদে নববীর মুসল্লীগণ সাধারণতঃ এসব গুণেই গুণান্বিত ছিলেন।

১১১তম আয়াতের শানে নুযূল ঃ অধিকাংশ মুফাসসেরের ভাষ্যমতে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে 'বায়আতে আকাবায়' অংশ গ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে। এ' বায়'আত নেয়া হয়েছিল মক্কায় মদীনার আনসারদের থেকে। তাই সূরাটি মদনী হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতগুলোকে মক্কী বলা হয়েছে।

'আকাবা' বলা হয় পর্বতাংশকে। এখানে আকাবা বলতে বোঝায় মিনার জমরায়ে আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। বর্তমানে হাজীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন পর্বতের এ অংশটিকে শুধু জমরা বাদ দিয়ে মাঠের সমান করে দেয়া হয়েছে। এখানে মদীনা থেকে আগত আনসারগণের তিন দফায় বায়আত নেয়া হয়। প্রথম দফা নেয়া হয় নবুওয়তের একাদশ বর্ষে। তখন মোট ছয় জন লোক ইসলাম গ্রহণ করে বায়'আত নিয়ে মদীনা ফিরে যান। এতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম ও নবী করীম (সাঃ)-এর চর্চা শুরু হয়। পরবর্তী বছর হজ্বের মৌসুমে বার জন লোক সেখানে একত্রিত হন। এদের পাঁচ জন ছিলেন পূর্বের এবং সাত জন ছিলেন নতুন। তাঁরা সবাই মহানবী (সাঃ)-এর হাতে বায়'আত নেন। এর ফলে মদীনায় মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, চল্লিশ জনেরও বেশী। তারা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আবেদন জানান যে, তাঁদেরকে কোরআনের তালীম দানের উদ্দেশে সেখানে কাউকে প্রেরণ করা হোক। তিনি হযরত মোসআব বিন ওমাইর (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন, যিনি তথাকার মুসলমানদের কোরআন পড়ান ও ইসলামের তাবলীগ করেন। ফলে মদীনার বিরাট অংশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়।

অতঃপর নবুওয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে সত্তর জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সেখানে একত্রিত হন। এ হলো তৃতীয় ও সর্বশেষ বায়'আতে আকাবা। সাধারণতঃ বায়'আতে আকাবা বলতে একেই বোঝানো হয়। এ বায়'আতটি ইসলামের মৌল আকীদা ও আমল, বিশেষতঃ কাফেরদের সাথে জেহাদ এবং মহানবী (সাঃ) হিজরত করে মদীনা গেলে তাঁর হেফাযত ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নেয়া হয়। বায়'আত গ্রহণকালে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রাঃ) বলেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এখন অঙ্গীকার নেয়া হচ্ছে; আপনার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোন শর্তারোপ করার থাকলে তা পরিষ্কার বলে দেয়া হোক। হুযুর (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্র ব্যাপারে শর্তারোপ করেছি যে, তোমরা সবাই তাঁরই এবাদত করবে; তাঁকে ছাড়া কারো এবাদত করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হলো যে, তোমরা আমার হেফাযত করবে যেমন নিজের জান-মাল ও সন্তানদের হেফাযত কর। তাঁরা আরয করলেন, এ শর্ত দু'টি পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? তিনি বললেন, জান্নাত। তাঁরা পুলকিত হয়ে বললেন, আমরা এর জন্য রাযী, এমন রাযী যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোন দিনই পেশ করব না এবং রহিতকরণকে পছন্দও করব না।

জেহাদের সর্বপ্রথম আয়াত ঃ মহানবী (সাঃ)-এর মক্কা শরীফে অবস্থানকালে এ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত কোন হুকুম ন্যাযিল হয়নি। এটিই সর্বপ্রথম জেহাদ সংক্রান্ত আয়াত, যা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। তবে এর উপর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয় ঃ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ (সূরা হজ্ব ৩৯) মক্কায় কোরাইশ বংশীয় কাফেরদের অগোচরে যখন বায়'আতে আকাবা সম্পাদিত হয় তখনই মহানবী (সাঃ) মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের আদেশ দিয়ে দেন। অতঃপর ক্রমশঃ সাহাবায়ে কেরামের হিজরতের ধারা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) নিজে আল্লাহ্র অনুমতির অপেক্ষায় থাকেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হিজরতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তাঁকে নিজের সহযাত্রী করার মানসে তখনকার মত নিবৃত রাখেন। – (মাযহারী)

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ থেকে فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, জেহাদের হুকুম পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও সকল কিতাবে নাযিল হয়েছিল। ইঞ্জিল (বাইবেলে) জেহাদের হুকুম নেই বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে, তা সম্ভবতঃ এজন্য যে, পরবর্তী খ্রীষ্টানরা ইঞ্জিলের যে বিকৃতি ঘটিয়েছে তার ফলে জেহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতগুলো খারিজ হয়ে যায় – 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ'। فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ বায়'আতে আকাবায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়, তা দৃশ্যতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মত। তাই আয়াতের শুরুতে ক্রয় শব্দের ব্যবহার করা হয়। উপরোক্ত বাক্যে মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়। কেননা, এর দ্বারা অস্থায়ী জান-মালের বিনিময়ে স্থায়ী জান্নাত পাওয়া গেল। চিন্তা করার ব্যাপার যে, এখানে ব্যয় হলো শুধু মাল। কিন্তু আত্মা মৃত্যুর পরও বাকী থাকবে। চিন্তা করলে আরো দেখা যায় যে, মালামাল

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ
السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ مَا كَانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ
لَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ
لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا
يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن
دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾ لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى
النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ
مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

(১১২) তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকূ ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহ্র দেওয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে। (১১৩) নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরেকদের মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্মীয় হোক– একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী। (১১৪) আর ইব্রাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে একথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ছিলেন বড় কোমলহৃদয়, সহনশীল। (১১৫) আর আল্লাহ্ কোন জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না – যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয় যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সব বিষয়ে ওয়াকেফহাল। (১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ্রই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের সাম্রাজ্য। তিনিই জিন্দা করেন ও মৃত্যু ঘটান, আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন সহায়ও নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই। (১১৭) আল্লাহ্ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।

হলো আল্লাহ্রই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে অর্থ-সম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেয়া সে অর্থের বিনিময়েই বান্দাকে জান্নাত দান করবেন। তাই হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, 'এ এক অভিনব বেচা-কেনা, মাল ও মূল্য উভয়ই তোমাদিগকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ্।' হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, 'লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ্ সকল মুমিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন।' তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ এ গুণাবলী হলো সেসব মুমিনের যাদের সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে – 'আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন।' আয়াতটি নাযিল হয়েছিল বায়'আতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী একটি বিশেষ জামাত সম্পর্কে। তবে আল্লাহ্র রাহে জেহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। আর اَلتَّائِبُوْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত যে গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তরূপে নয়। কারণ,. আল্লাহ্র রাহে কেবল জেহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তবে এ গুণাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জান্নাতের উপযুক্ত, তারা এ সকল গুণের অধিকারী হয়। বিশেষতঃ বায়'আতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবাদের এ সকল গুণ ছিল।

অধিকাংশ মুফাসসেরের মতে اَلسَّائِحُوْنَ এর অর্থ صائمون অর্থাৎ রোযাপালনকারী। শব্দটি سياحت (দেশ ভ্রমণ) থেকে উদ্ভূত। ইসলাম-পূর্ব যুগে খ্রীষ্ট ধর্মে দেশ ভ্রমণকে এবাদত মনে করা হতো। অর্থাৎ, মানুষ পরিবার-পরিজন ও ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। ইসলাম ধর্মে একে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে রোযা পালনের এবাদতকে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সংসার ত্যাগ। অথচ রোযা এমন এক এবাদত, যা পালন করতে গিয়ে যাবতীয় পার্থিব বাসনা ত্যাগ করতে হয় এবং এরই ভিত্তিতে কতিপয় রেওয়ায়েতে জেহাদকেও দেশ ভ্রমণের অনুরূপ বলা হয়। এ হাদীসটি ইবনে মাজা, হাকেম ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সহী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হুযূরে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, অর্থাৎ, 'আমার উম্মতের দেশভ্রমণ سياحة امتى الجهاد فى سبيل الله হলো জেহাদ ফীসাবীলিল্লাহ।'

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোরআন মজীদে ব্যবহৃত سائحين শব্দের অর্থ রোযাদার। হযরত ইকরিমা (রাঃ) سائحين শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এরা হলো এলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী, যারা এলম হাসিলের জন্য ঘর-বাড়ী ছেড়ে বের হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতে মুমিন-মুজাহিদের সাতটি গুণ যথা ঃ اَلتَّائِبُوْنَ

اَلْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ

بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ উল্লেখ করে অষ্টম গুণ হিসেবে বলা হয়েছে وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ এতে রয়েছে উপরোক্ত সাতটি গুণের সমাবেশ। অর্থাৎ, সাতটি গুণের মধ্যে যে তফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো এই যে, এঁরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা তথা শরীয়তের হুকুমের অনুগত ও তার হেফাযতকারী।

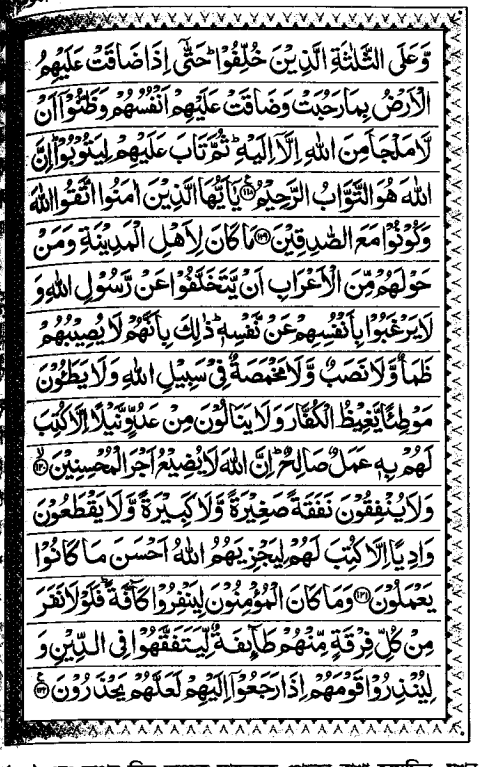

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ
لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ
اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ
حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ
لَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ
ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ
مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًاۤ اِلَّا كُتِبَ
لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾
وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ
وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢١﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ
لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

(১১৮) এবং অপর তিন জনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই—অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দয়াময় করুণাশীল। (১১৯) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (১২০) মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহ্র সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহ্র পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যাকিছু প্রাপ্ত হয়—তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না। (১২১) আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন। (১২২) আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে?

কোরআন মজীদ তাবুক যুদ্ধের সময়টিকে 'সঙ্কটকময় মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছে। কারণ, সে সময় মুসলমানগণ বড় অভাব-অনটনে ছিলেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, সে সময় দশ জনের জন্য ছিল একটি মাত্র বাহন, যার উপর পালা করে তাঁরা আরোহণ করতেন। তদুপরি সফরের সম্বলও ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। অন্যদিকে ছিল গ্রীষ্মকাল, পানিও ছিল পথের মাত্র কয়েকটি স্থানে এবং তাও অতি অল্প পরিমাণে।

مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ আয়াতের এ বাক্যে যে, কিছু লোকের অন্তরের বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ ধর্মান্তর নয়, বরং এর অর্থ হলো,-কড়া গ্রীষ্ম ও সম্বলের স্বল্পতা হেতু সাহস হারিয়ে ফেলা এবং জেহাদ থেকে গা বাঁচিয়ে চলা। হাদীসের রেওয়ায়েতগুলোও এ অর্থেরই সমর্থক। এই ছিল তাঁদের অপরাধ। যেজন্য তাঁরা তওবা করেন এবং তা কবুল হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا এখানে خلفوا অর্থ যাদের পেছনে রাখা হয়েছে। তবে মর্মার্থ হলো, যাঁদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হল। এঁরা তিন জন হলেন হযরত কা'আব ইবনে মালেক, শা-এর মুরারা ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) তাঁরা তিন জনই ছিলেন আনসারের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। যাঁরা ইতিপূর্বে বায়'আতে আ'কাবা ও মহানবী (সাঃ)-এর সাথে বিভিন্ন জেহাদে শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্রে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফেকরা কপটতার দরুন এ যুদ্ধে শরীক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুললো। অতঃপর যখন হুযুরে আকরাম (সাঃ) জেহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফেকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল আর মহানবী (সাঃ)-ও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহ্র সোপর্দ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বস্ত হলেন, ফলে তারা দিব্যি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে আর ঐ তিন বুযুর্গ সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারাও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হুযুর (সাঃ)-কে আশ্বস্ত করুন। কিন্তু তাঁদের বিবেক সায় দিল না। কারণ, প্রথম অপরাধ ছিল জেহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহ্র নবীর সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন যে, অপরাধের সাজাস্বরূপ তাদের সমাজচ্যুতির আদেশ দেয়া হয়। আর এদিকে কোরআন মজীদ সকল গোপন রহস্য উদঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত অবস্থাও ফাঁস করে দেয়। অত্র সূরার ৯৪ থেকে ৯৮ আয়াত يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٦﴾ اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ পর্যন্ত রয়েছে এদের অবস্থা ও নির্মম পরিণতির বর্ণনা। কিন্তু যে তিন জন সাহাবী মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন, অত্র আয়াতটি নাযিল হয় তাঁদের তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্বিসহ অবস্থা ভোগের পর তারা আবার আনন্দিত মনে রসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জেহাদ থেকে বিরত থাকার যে ত্রুটি কতিপয় নিষ্ঠবান সাহাবীর দ্বারাও সংঘটিত হয়ে গেল এবং পরে তাঁদের তওবা কবুল হলো,

এ ছিল তাঁদের তাকওয়া ও খোদাভীতিরই ফলশ্রুতি। তাই এ' আয়াতের মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানকে তাকওয়ার হেদায়েত দান করা হয়েছে। আর وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ (তোমরা সবাই সত্যবাদীদের সাথে থাক।) বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যবাদীদের সাহচর্য এবং তাদের অনুরূপ আমলের মাধ্যমেই তাকওয়া লাভ হয়। এখানে এমনও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ঐ সকল সাহাবীর পদস্খলনের মধ্যে মুনাফেকদের সাথে উঠাবসা ও তাদের পরামর্শেরও একটা দখল ছিল। তাই নাফরমানদের সাহচর্য ত্যাগ করে সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোরআনের এ আয়াতে আলেম ও সালেহ্গণের পরিবর্তে 'সাদেকীন' শব্দ ব্যবহার করে আলেম ও সালেহ্-এর প্রকৃত পরিচয় দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, সে ব্যক্তিই যথার্থ সালেহ্ বা নেককার যে ভেতরে ও বাহিরে সমান এবং নিয়ত ও ইচ্ছায় এবং কথা ও কর্মে সমান সত্য হয়।

দ্বীনের এলম হাসিল ও সংশ্লিষ্ট নীতি-নিয়ম ঃ

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটি দ্বীনের এলম হাসিলের মৌলিক দলীল। চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এতে দ্বীনী এলমের এক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী এবং এলম হাসিলের পর আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। এখানে বিষয়টির কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

দ্বীনী এলমের ফযীলত ঃ দ্বীনী এলমের অগণিত ফযীলত ও সওয়াব সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম ছোট বড় অনেক কিতাব লিখেছেন। এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত হাদীস পেশ করা হলো। তিরমিযী শরীফে আবুদ্দারদা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্ত এলম হাসিল করার উদ্দেশে কোন পথ দিয়ে চলে, আল্লাহ্ এই চলার সওয়াব হিসাবে তার রাস্তাকে জান্নাতমুখী করে দেবেন। আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ দ্বীনী জ্ঞান আহরণকারীর জন্য নিজেদের পালক বিছিয়ে রাখেন। আলেমের জন্য আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টি এবং পানির মৎস্যকুল দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করে। অধিকহারে নফল এবাদতকারী লোকের উপর আলেমের ফযীলত অপরাপর তারকারাজির উপর পূর্ণিমা চাঁদেরই অনুরূপ। আলেমসমাজ নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণ স্বর্ণ, রূপার মীরাস রেখে যান না। তবে এলমের মীরাস রেখে যান। তাই যে ব্যক্তি এলমের মীরাস পায়, সে যেন মহা-সম্পদ লাভ করলো।— (কুরতুবী)

ইমাম দারেমী (রহঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন যে, জনৈক সাহাবী নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। বনী-ইসরাঈলের দু'জন লোক ছিলেন, যাদের একজন ছিলেন আলেম। তিনি শুধু নামায ও লোকর দ্বীনী তা'লীম দানে ব্যস্ত থাকতেন। অপরজন সারাদিন রোযা রাখতেন এবং সারা রাত এবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। এ দু'জনের মধ্যে কার ফযীলত বেশী?' হুযুর (সাঃ) বলেন, সেই আলেমের ফযীলত আবেদের উপর এমন, যেমন আমার ফযীলত তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর।— (কুরতুবী)

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন, শয়তানের মোকাবেলায় একজন ফেকাহ্বিদ এক হাজার আবেদের চাইতেও শক্তিশালী ও ভারী।— (তিরমিযী, মাযহারী) তিনি আরো বলেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। (এক) সদকায়ে জারিয়া—(যেমন, মসজিদ, মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান)। (দুই) এলম-যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়। (যেমন, শাগরিদ রেখে গিয়ে এলমে দ্বীনের চর্চা জারী রাখা বা কোন কিতাব লিখে যাওয়া।) (তিন) নেককার সন্তান—যে তার পিতার জন্য দোয়া করে এবং সওয়াব পাঠাতে থাকে।— (কুরতবী)

দ্বীনী এলম ফরযে-আইন অথবা ফরযে-কেফায়া হওয়ার বিবরণ ঃ

ইবনে আ'দী ও বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন– طلب العلم فريضة على كل مسلم 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর এলম শিক্ষা করা ফরয।' বলাবাহুল্য, এ হাদীসও উপরোক্ত অপরাপর হাদীসে উল্লেখিত 'এলম' শব্দের অর্থ দ্বীনের এলম। তবে অন্যান্য বিষয়ের মত দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানও মানুষের জন্য জরুরী। কিন্তু হাদীসসমূহে সে সবের ফযীলত বর্ণিত হয়নি। অতঃপর দ্বীনী এলম বলতে একটি মাত্র বিষয়ই বোঝায় না; বরং তা বহু বিষয়েরই উপর পরিব্যাপ্ত এক বিরাট ব্যবস্থা। সুতরাং সমস্ত বিষয়ই একা আয়ত্ত করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই উল্লেখিত হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানদের উপর যে এলম তলব ফরয করা হয়েছে, তার অর্থ হবে এই যে, সমস্ত মুসলমানদের জন্য দ্বীনী এলমের শুধু সে অংশটুকু আয়ত্ত করাই ফরয করা হয়েছে, যা ঈমান ও ইসলামের জন্য জরুরী এবং যার অবর্তমানে মানুষ না পারে ফরযসমূহ আদায় করতে, আর না পারে হারাম বিষয় থেকে বাঁচতে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়; কোরআন-হাদীসের মাসআলা-মাসায়েল, কোরআন-হাদীস থেকে আহরিত শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম ও তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আয়ত্তে আনা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভবও নয় এবং ফরযে-আইনও নয়। তবে গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য তা ফরযে কেফায়াহ্। তাই প্রত্যেকটি শহরেই যদি শরীয়তের উপরোক্ত এলম ও আইন-কানুনের একজন সুদক্ষ আলেম থাকেন, তবে অন্যান্য মুসলমান এ ফরযের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। কিন্তু যদি শহর বা পল্লীতে একজনও অভিজ্ঞ আলেম না থাকেন, তবে তাদের কাউকেই আলেম বানানো বা অন্যখান থেকে কোন আলেমকে ডেকে এনে এখানে রাখার ব্যবস্থা করা স্থানীয় লোকের পক্ষে ফরয। যাতে করে যে কোন প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে তার কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে সেমত আমল করা যায়। দ্বীনী এলম সম্পর্কে ফরযে-আইন ও ফরযে-কেফায়ার তফছীল নিম্নরূপ ঃ

ফরযে-আইন ঃ ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহের জ্ঞান হাসিল করা, পাকী-নাপাকীর হুকুম-আহকাম জানা, নামায-রোযা ও অন্যান্য এবাদত বা শরীয়ত যেসব বিষয় ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর জ্ঞান রাখা এবং যেসব বিষয় হারাম বা মকরূহ করে দিয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক, তার জন্য যাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানা, যে হজ্জ আদায় করতে সমর্থ তার পক্ষে তার আহ্কাম ও মাসায়েল জেনে নেয়া, যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনা-বেচা বা শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত, তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম জেনে রাখা এবং যে বিয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে, তার পক্ষে বিয়ে ও তালাকের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হওয়া ফরয। এক কথায় শরীয়ত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম-আহকাম ও মাসআলা- মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয।

এলমে-তাসাউফ ও ফরযে-আইনের অন্তর্ভুক্ত ঃ শরীয়তের যাহেরী হুকুম তথা নামায-রোযা প্রভৃতি যে ফরযে-আইন ও

সর্বজনবিদিত। তাই সেগুলোর এলম রাখাও ফরযে-আইন। হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের টীকায় লিখেছেন যে, যেহেতু বাতেনী আমলও সকলের জন্য ফরযে-আইন, তাই বাতেনী আমল ও বাতেনী হারাম বস্তুর এলম-যাকে পরিভাষায় 'এলমে-তাসাউফ' বলা হয়, তা হাসিল করাও ফরযে-আইন।

অধুনা বিভিন্ন এলম., তত্ত্বজ্ঞান, কাশ্‌ফ ও আত্মোপলব্ধির সম্মিলিত রূপকে এলমে তাসাউফ বলা হয়। তবে এখানে ফরযে-আইন বলতে বাতেনী আমলের শুধু সে অংশকেই বোঝায়, যা ফরয-ওয়াজিবের তফসীল। যেমন, বিশুদ্ধ আকীদা, যার সম্পর্ক বাতেন তথা অন্তরের সাথে অথবা সবর, শোকর ও তাওয়াক্কুল প্রভৃতি এর বিশেষ স্তর পর্যন্ত ফরয, কিংবা গর্ব-অহংকার, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কৃপণতা ও দুনিয়ার মোহ প্রভৃতি কোরআন ও হাদীস মতে হারাম। এগুলোর গতি-প্রকৃতি, অথবা সেগুলো হাসিল করার কিংবা হারাম থেকে বেঁচে থাকার নিয়ম-নীতি জেনে রাখাও সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। এ সকল বিষয়ের উপরই হল এলমে তাসাউফের আসল ভিত্তি, যা ফরযে আইন।

ফরযে কেফায়া ঃ পূর্ণ কোরআন মজীদের অর্থ ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হওয়া, সমুদয় হাদীসের মর্ম বোঝা, বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকা, কোরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আহকাম ও মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন এবং এ সমস্ত ব্যাপারে সাহাবা, তাবেয়ীন ও মুজতাহেদ ইমামগণের ভাষ্য ও আমল থেকেও এ সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করা দুঃসাধ্য। তাই শরীয়ত একে ফরযে-কেফায়া রূপে সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ কিছু লোক যদি প্রয়োজনমত এগুলোর জ্ঞান হাসিল করে নেয়, তবে অন্যান্যরাও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

দ্বীনী এলমের সিলেবাস ঃ কোরআন মজীদ আলোচ্য আয়াতের একটি মাত্র শব্দে দ্বীনী এলমের প্রকৃতি ও তার পাঠ্যক্রম কি হবে তা ব্যক্ত করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ অথচ يتعلمون الدين (যেন দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করে) ও বলা যেত। কিন্তু কোরআন এখানে تعلم এর স্থলে تفقه শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছে যে, নিছক দ্বীনের এলম 'পাঠ' করাই যথেষ্ট নয়। কারণ, ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরাও তা পাঠ করে, আর শয়তান তো এক্ষেত্রে তাদের সকলের আগে; বরং এলমে দ্বীনের উদ্দেশ্য হলো দ্বীনকে অনুধাবন করা কিংবা তাতে বিজ্ঞতা অর্জন করা। تفقه শব্দের অর্থও তাই। এটি فقه থেকে উদ্ভূত। فقه অর্থ বোঝা, অনুধাবন করা। উল্লেখ্য যে, কোরআন মজীদ এ আয়াতে صيغه مجرد ব্যবহার করে لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (যেন তারা দ্বীনকে বোঝে নেয়) বলেনি; বরং একে باب تفعل এ নিয়ে لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ বলেছে। ফলে এতে পরিশ্রম ও সাধনাও শামিল হয়ে গেছে। সেমতে ব্যক্যের মর্ম হবে "তারা যেন দ্বীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাতে দক্ষতা হাসিল করে।" বলাবাহুল্য, পাকী-নাপাকী, নামায-রোযা ও হজ্জ-যাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানাকেই দ্বীনকে অনুধাবন করা বলা যাবে না। বরং দ্বীনের সত্যিকার অনুধাবন হলো, তাকে বোঝে তার প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং যাবতীয় গতিবিধির হিসাব দিতে হবে রোজ হাশরে। দুনিয়ার এ জীবন তাকে কিরূপে অতিবাহিত করতে হবে—মূলতঃ এ চিন্তাই হলো দ্বীন অনুধাবন। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) 'ফেকাহ্'-এর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা' হলো এই যে, "ফেকাহ্ সে শাস্ত্রকে বলা হয়, যাতে মানুষ নিজের করণীয় কাজকে বোঝে নেয় এবং সে সকল কাজকেও বোঝে নেয় যা' থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য জরুরী।" অধুনা মাসআলা-মাসায়েলের বিস্তারিত জ্ঞানকেই যে, 'এলমে-ফেকাহ্' বলা হয় তা' পরবর্তী যুগের পরিভাষা। কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফেকাহ্র তাৎপর্য তাই যা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের সমস্ত কিতাব পাঠ করে নিল, কিন্তু দ্বীনকে পুরোপুরি বুঝতে পারল না, সে কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় আদৌ আলেম নয়।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় দ্বীনের এলম হাসিল করার অর্থ হলো, দ্বীন সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন করা। তা কিতাবের মাধ্যমে বা আলেমগণের সাহায্যে যে কোন উপায়েই হোক-সবই একই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত।

ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ঃ দ্বীনের জ্ঞান হাসিলের পর ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব কি হবে তার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ (যেন তারা জাতিকে আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে ভয়প্রদর্শন করে) বাক্যটিতে। উল্লেখ্য যে, এখানে আলেমগণের দায়িত্ব বলা হয়েছে انذار বা ভয়প্রদর্শন। এটি انذار -এর শাব্দিক তরজমা, যথাযথ মর্মার্থ নয়। বস্তুতঃ ভয়প্রদর্শন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের ভীতিপ্রদর্শন হলো, চোর-ডাকাত, শত্রু, হিংস্রজন্তু ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে ভয়প্রদর্শন করা। অন্য ধরনের হলো, পিতা স্নেহবশে আপন ছেলেকে আগুন, বিষাক্ত প্রাণী ও অন্যান্য কষ্টদায়ক বস্তু থেকে যে ভয়প্রদর্শন করে। এর মূলে থাকে প্রগাঢ় মমতা, স্নেহবোধ। এ ভয়প্রদর্শনের কলাকৌশলও ভিন্ন। আরবীতে একেই বলা হয় انذار - এজন্য নবী-রসূলগণ نذير উপাধীতে ভূষিত। আলেমগণের উপর জাতিকে ভয়প্রদর্শনের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা মূলতঃ নবীগণের আংশিক মীরাস-যা হাদীসমতে ওলামায়ে কেরাম লাভ করেছেন।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, নবীগণ بشير ও نذير উভয় উপাধিতেই ভূষিত। نذير এর অর্থ উপরে জানা গেল। আর بشير অর্থ সুসংবাদ দানকারী। সুতরাং নবীগণের উপর দায়িত্ব হলো সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দান করা। আলোচ্য আয়াতে যদিও শুধু ভয়প্রদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য দলীলের দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, আলেমগণের অন্যতম দায়িত্ব হলো নেক্কার বান্দাদিগকে সুসংবাদ দেয়া। তবে এখানে শুধু ভয়প্রদর্শনের উল্লেখ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষের আসল কাজ দু'টি। (এক) দুনিয়া ও আখেরাতে যা কল্যাণকর, তা অবলম্বন করা এবং (দুই) অকল্যাণ ও অনিষ্টকর কাজ থেকে বেঁচে থাকা। আলেমও দার্শনিকদের ঐকমত্যে শেষোক্ত কাজটিই গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ
ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ
ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ
أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا
ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ
رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٢٥﴾ أَوَلَا يَرَوْنَ
أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا
يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ
نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ
ٱنصَرَفُواْ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا
يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

(১২৩) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (১২৪) আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। (১২৫) বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করলো। (১২৬) তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতিবছর তারা; দু' একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না। (১২৭) আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় যে, কোন মুসলমান তোমাদের দেখছে কি—না— অতঃপর সরে পড়ে। আল্লাহ্ ওদের অন্তরকে সত্য বিমুখ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা নির্বোধ সম্প্রদায়। (১২৮) তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (১২৯) এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ছিল জেহাদের প্রেরণা। আলোচ্য ১২৩ তম আয়াত থেকে ১২৭ তম আয়াতের প্রথম আয়াতে يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ – এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হচ্ছে যে, কাফেররা দুনিয়ার সর্বত্র রয়েছে। তবে কোন্ নিয়মে তাদের সাথে জেহাদ করা হবে? এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, প্রথমে তাদের সাথে জেহাদ করবে। নিকটবর্তী দু'রকমের হতে পারে। (এক) অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ, যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী, প্রথমে তাদের সাথে জেহাদ কর। (দুই) গোত্র, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে যারা নিকটবর্তী অন্যান্যদের আগে তাদের সাথে জেহাদ চালিয়ে যাও। কারণ, ওদের কল্যাণ সাধনই ইসলামী জেহাদের উদ্দেশ্য। আর কল্যাণ সাধনের বেলায় আত্মীয়-স্বজন অগ্রগণ্য। যেমন, কোরআনে রসূলে করীম (সাঃ)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে– وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ, "হে রসূল, নিজের নিকটাত্মীয়গণকে আল্লাহ্র আযাবের ভয়প্রদর্শন করুন।" তাই তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাগ্রে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহ্র বাণী শুনিয়ে দেন। অনুরূপ, তিনি স্থান হিসাবে প্রথমে মদীনার আশ-পাশের কাফের তথা বনু-কোরাইযা, বনু –নযীর ও খায়বরবাসীদের সাথে বোঝা পড়া করেন। তারপর দূরবর্তী লোকদের সাথে জেহাদ করেন এবং সবশেষে রোমানদের সাথে জেহাদের আদেশ আসে, যার ফলে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً – غِلْظَةً অর্থ কঠোরতা, শক্তিমত্তা। বাক্যের মর্ম হলো, কাফেরদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোন দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে। فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا বাক্য থেকে বোঝা যায়, কোরআনের আয়াতের তেলাওয়াত, চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ, ঈমানের নূর ও আস্বাদ বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ফরমাঁবরদারী সহজ হয়ে উঠে। এবাদতে স্বাদ পায়, গুনাহের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা জন্মে ও কষ্টবোধ হয়।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি নূরের শ্বেতবিন্দুর মত দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেতবিন্দু সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। তেমনি গুনাহ ও মুনাফেকীর ফলে প্রথমে অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। অতঃপর পাপাচার ও কুফরীর তীব্রতার সাথে সাথে সে কাল দাগটিও বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর কাল হয়ে যায়। – (মাযহারী) এজন্য সাহাবায়ে কেরাম একে অন্যকে বলতেন: আস, কিছুক্ষণ একত্রে বসি এবং দ্বীন ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করি, যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ বাক্যে মুনাফেকদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের কপটতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের পরিণতিতে প্রতিবছরই তারা কখনো একবার, কখনো দু'বার নানা ধরনের বিপদে পতিত হয়। যেমন, কখনো তাদের কাফের মিত্ররা পরাজিত হয়, কখনো তাদের গোপন অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা দিবানিশি-মর্মপীড়া ভোগ করে। এখানে এক বা দু'বার বলতে কোন বিশেষ সংখ্যা

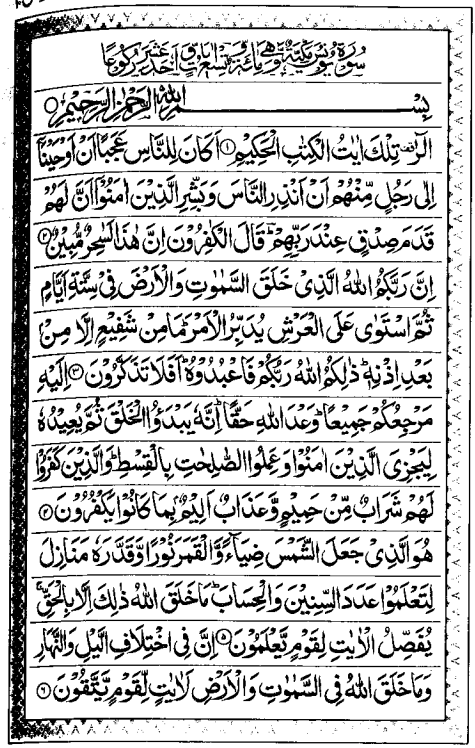

سُورَةُ يُونُسَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَتِسْعُ آيَاتٍ وَإِحْدَى عَشَرَ رُكُوعًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا
إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ
قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ٢
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ
بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣ إِلَيْهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ٤
هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ٦

সূরা ইউনুস

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১০৯

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) الر এগুলো হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত। (২) মানুষের কাছে কি আশ্চর্য লাগছে যে, আমি ওহী পাঠিয়েছি তাদেরই মধ্য থেকে একজনের কাছে যেন তিনি মানুষকে সতর্ক করেন এবং সুসংবাদ শুনিয়ে দেন ঈমানদারগণকে যে, তাঁদের জন্য সত্য মর্যাদা রয়েছে তাঁদের পালনকর্তার কাছে। কাফেররা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে এ লোক প্রকাশ্য যাদুকর। (৩) নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ যিনি তৈরী করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পারবে না তবে তাঁর অনুমতি ছাড়া ইনিই আল্লাহ্‌ তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তোমরা কি কিছুই চিন্তা কর না? (৪) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার আবার পুনর্বার তৈরী করবেন তাদেরকে বদলা দেয়ার জন্য, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব এ জন্যে যে, তারা কুফরী করছিল। (৫) তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিলসমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ্‌ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে। (৬) নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীনে, সবই হল নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা ভয় করে।

উদ্দেশ্য নয়, বরং বলা হচ্ছে যে, তাদেরই এই দুর্ভোগের পালা শেষ হওয়ার নয়। এ সত্ত্বেও কি তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

এ দু'টি আয়াত সূরা তওবার সর্বশেষ আয়াত, তাতে বলা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) সকল সৃষ্টির উপর, বিশেষতঃ মুসলমানদের উপর বড় দয়াবানও স্নেহশীল। সর্বশেষ আয়াতে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনার যাবতীয় চেষ্টা-তদবীরের পরও যদি কিছু লোক ঈমান গ্রহণে বিরত থাকে, তবে ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন।

সূরা তওবার শেষে একথা বলার সঙ্গত কারণ হলো এই যে, এর সর্বত্র রয়েছে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও যুদ্ধ-জেহাদের বর্ণনা, যা' আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানের সর্বশেষ পন্থা রূপে বিবেচিত। আর এ পন্থা তখনই অবলম্বন করা হয়, যখন মৌখিক দাওয়াত ও ওয়াজ তবলীগে হেদায়েতের সকল আশা তিরোহিত হয়। তবে নবীগণের সমস্ত কাজ হলো স্নেহ-মমতা ও হামদর্দির সাথে আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে ডাকা, তাদের পক্ষ থেকে অবজ্ঞা ও যাতনার সম্মুখীন হলে, তা আল্লাহ্‌র প্রতি সোপর্দ করা এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখা। এখানে 'আরশে আযীমের অধিপতি' বলার উদ্দেশ্য একথা বোঝানো যে, তাঁর অনন্ত কুদরত সমগ্র জগতের উপর পরিব্যাপ্ত। হযরত উবাই বিন কা'আব (রাঃ)-এর মতে এ দু'টি আয়াত হলো কোরআন মজীদের সর্বশেষ আয়াত। এরপর আর কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এ অবস্থায় নবী করীম (সাঃ)- এর ইন্তেকাল হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-ও এ মতই পোষণ করেন।—(কুরতুবী)

সূরা তওবা সমাপ্ত

সূরা ইউনুস

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ইউনুস মক্কায় অবতীর্ণ কেউ কেউ সূরার মাত্র তিনটি আয়াতকে মদনী বলে উল্লেখ করেছেন, যা মদীনায় হিজরত করার পর নাযিল হয়েছে। এই সূরার মধ্যেও কোরআন পাক এবং ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী-তওহীদ, রেসালত, আখেরাত ইত্যাদি বিষয়ের যথার্থতা বিশ্বচরাচর এবং তার মধ্যকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনশীল ঘটনাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দেখিয়ে ভালো করে বোদগম্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশমূলক, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং কাহিনীর অবতারণা করে সে সমস্ত লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যারা আল্লাহ্‌ তাআলার এ সব প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের উপর একটুও চিন্তা করে না। এতদসঙ্গে অংশীবাদের খণ্ডন এবং তদসম্পর্কিত কিছু সন্দেহেরও উত্তর দেয়া হয়েছে। এ সূরার বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিড়ভাবে চিন্তা করলে পূর্ববর্তী সূরা তওবা আর এ সূরার মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তাও সহজেই বোঝা যায়। সূরা তওবায় এসব উদ্দেশ্যাবলী (তওহীদ, রেসালত, আখেরাত ইত্যাদি) হাসিল করার জন্যই অবিশ্বাসী কাফেরদের সাথে জেহাদ করা এবং কুফর ও শেরেকের শক্তিকে সাধারণ উপকরণের মাধ্যমে পরাস্থ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সূরা যেহেতু জেহাদের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাই উপরোল্লেখিত উদ্দেশ্যাবলীকে মক্কী যিন্দেগীর রীতি অনুযায়ী শুধু দলীল দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে।

الر এগুলোকে হরফে 'মোকাততাআত্' বলা হয়, যা কোরআন মজিদের অনেক সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, الم ، عسق، ق، حم ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তফসীরকারকগণ অনেক কিছু লিখেছেন। এ ধরনের সমস্ত হরুফে

মোকাততাআহ্ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং অধিকাংশ বুযুর্গানে কেরামের অভিমত হলো এই যে, এগুলো বিশেষ কিছু গুপ্ত কথা, যার অর্থ হয়তো বা হুযূর (সাঃ)– কে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সাধারণ উম্মতকে শুধু সে সমস্ত জ্ঞান জ্ঞাতব্য সম্বন্ধেই অবহিত করেছেন, যা তারা বহন করতে পারবে এবং যা না হলে তাদের কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারত। আর হরুফে মোকাততাআহ্র গুঢ় তত্ত্ব এমন কোন জ্ঞাতব্য বিষয় নয় যে, তা না জানলে উম্মতের ঈমান ও আমলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, কিংবা এমনও নয় যে, এগুলোর তত্ত্বকথা না জানলে উম্মতের কোন ক্ষতি হতে পারে। এ জন্যই হুযূর (সাঃ)ও এগুলোর অর্থ উম্মতের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে বর্ণনা করেননি। অতএব আমাদের পক্ষেও এগুলোর অর্থ বের করার পেছনে সময় ব্যয় করা উচিত হবে না। কারণ, এটাতো সত্য কথা যে, এসব শব্দের অর্থ জানার মধ্যে যদি আমাদের কোন রকম মঙ্গল নিহিত থাকত, তাহলে রহমতে–আলম (সাঃ) অন্ততঃ এগুলোর অর্থ বিশ্লেষণে কোন রকম কার্পণ্য করতেন না।

দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে মুশরেকদের একটি সন্দেহ ও প্রশ্নের উত্তর। সন্দেহটি ছিলো এই যে, কাফেররা তাদের মূর্খতার দরুন সাব্যস্ত করে রেখেছিল যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যে নবী বা রসূল আসবেন তিনি মানুষ হবেন না বরং তিনি মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হওয়াটাই উচিত। কোরআন পাক বিভিন্ন জায়গায় তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার উত্তর বিভিন্ন প্রকারে দিয়েছে। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ ''যমীনের উপর যদি ফেরেশতারা বাস করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য কোন ফেরেশতাকেই রসূল বানিয়ে পাঠাতাম।'' যার মূল কথা হলো এই যে,রেসালতের উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রসূল এবং যাদের মধ্যে রসূল পাঠানো হচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। বস্তুতঃ ফেশেতার সম্পর্ক থাকে ফেরেশতাদের সাথে আর মানুষের সম্পর্ক থাকে মানুষের সাথে। যখন মানুষের জন্য রসূল পাঠানোটাই উদ্দেশ্য, তখন কোন মানুষকেই রসূল বানানো উচিত।

এই আয়াতে এ বিষয়টিই অন্যভাবে বলা হয়েছে যে, এ কারণে এসব লোকের বিস্মিত হওয়া যে, মানুষকে কেন রসূল বানানো হলো এবং সে মানুষকেই বা কেন নাফরমান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্র আযাবের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য এবং যারা আল্লাহ্র ফরমাঁবরদার তাদেরকে সওয়াবের সুসংবাদ শুনিয়ে দেয়ার জন্য দায়িত্ব দেয়া হলো? এই বিস্ময় প্রকাশই একটা বিস্ময়ের বিষয়। কারণ, মানুষের কাছে মানুষকে রসূল করে পাঠোনোই তো বুদ্ধিমত্তার কাজ। আশ্চর্য হওয়ার কারণ তখনই হতো যদি মানুষের কাছে মানুষ না পাঠিয়ে ফেরেশতা বা অন্য কাউকে পাঠানো হতো।

أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ বাক্যের দ্বারা সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এখানে قدم অর্থ পা। যেহেতু পা–ই মানুষের চেষ্টা–তদবীর এবং উন্নতির চাবিকাঠি হয়ে থাকে, সেহেতু ভাবার্থ হিসেবে উচ্চমর্যাদাকে আরবীতে 'কদম' (পদমর্যাদা) বলে দেয়া হয়। আর 'সত্যের পা' বলে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, এই উচ্চমর্দাদা যা তাঁরা পাবে তা সত্য ও সুনিশ্চিত এবং তা চিরকাল থাকার মতো প্রতিষ্ঠিতও বটে। পৃথিবীর পদমর্যাদার মতো নয়। মোটকথা, . শব্দ ব্যবহার করে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, আখেরাতের পদমর্যাদা যেমন সত্য–সঠিক, তেমনি পরিপূর্ণ এবং চিরস্থায়ীও বটে। অতএব, বাক্যের অর্থ দাঁড়ালো এই যে, ঈমানদারদেরকে এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাঁদের জন্যে তাঁদের পালনকর্তার কাছে অনেক বড় সম্মানিত মর্যাদা রয়েছে যা তাঁরা নিশ্চিতই পাবে এবং পাওয়ার পর কখনো তা শেষ হয়ে যাবে না। চিরকালই তারা সেই সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে। কোন কোন মুফাসসের বলেছেন, এক্ষেত্রে صدق শব্দ প্রয়োগের মাঝে এমন ইশারাও করা উদ্দেশ্য যে, বেহেশতের এসব উচ্চমর্যাদা একমাত্র সত্য নিষ্ঠা ও এখলাসের কারণেই পাওয়া যাবে। শুধু মৌখিকভাবে ঈমানের বাক্য উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখ এবং অন্তর উভয়টির মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনবে। তার অনিবার্য ফলাফল হলো নেক কাজের উপর পাবন্দী করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয় আয়াতে তওহীদকে এমন অনস্বীকার্য বাস্তবতার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার মধ্যে অতঃপর সমস্ত কাজ–কর্ম পরিচালনার মধ্যে যখন আল্লাহ্ তাআলার কোন শরীক–অংশীদার নেই, তখন এবাদত–বন্দেগী এবং হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অন্য কেউ কি করে শরীক হতে পারে? বরং এতে (এবাদতে) অন্য কাউকে শরীক করা একান্তই অবিচার এবং সীমালংঘনের শামিল। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে (আল্লাহ্ পাক) মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমাদের পরিভাষায় সময়ের সে পরিমাণকেই দিন বলা হয়, যা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সীমিত। আর এটা প্রকাশ্য যে, আসমান–যমীন ও তারকা—নক্ষত্রের সৃষ্টির পূর্বে সূর্যের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে সূর্য উঠা এবং সূর্য ডুবার হিসাব কি করে হবে! কাজেই (দিন বলতে) এখানে ঐ পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য যা এই পৃথিবীতে সূর্য উঠা এবং ডুবার মাঝখানে হয়ে থাকে।

এই ছয় দিনের সামান্য সময়ে এতো বড় বিশ্ব যা আসমান, যমীন, তারকারাজি এবং এই বিশ্বে যত কিছু আছে সমস্তকে তৈরী করে দেয়া একমাত্র সে পবিত্র 'যাতে–খোদা–ওয়ান্দী'র পক্ষেই সম্ভব ছিল যিনি সমস্ত কিছুর উপরে কুদরত রাখেন। তাঁর সৃষ্টিকার্যের জন্য না আগে থেকে কোন উপকরণের প্রয়োজন, না কোন কারিগর বা খাদেমের প্রয়োজন। বরং আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ কুদরতের এমনই শান যে, যখনই তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন কোন বস্তু বা কারো সাহায্য ছাড়াই এক মুহূর্তে তৈরী করে ফেলেন। এই ছয় দিনের অবকাশও হয়ত কোন বিশেষ হেকমত এবং মঙ্গলের জন্যই গ্রহণ করা হয়েছিল। না হয় তিনি এই অসামান, যমীন এবং বিশ্বের সমস্ত কিছু এক মুহূর্তে তৈরী করে দিতে পারতেন। তারপর বলেছেন, ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ, আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কোরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ পাকের আরশ এমন এক সৃষ্টি যা সমস্ত আসমান, যমীন এবং সমগ্র বিশ্ব–জাহানকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। গোটা সৃষ্টিজগত তারই বেষ্টনীর মধ্যে আবর্তিত।

এ তিনটি আয়াতে সমগ্র সৃষ্টজগতের বহু নিদর্শন উল্লেখিত হয়েছে, যা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর পূর্ণ কুদরত ও পরিপূর্ণ হেকমতের স্বাক্ষর বহন করে এবং এ দাবীর প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, আল্লাহ্ পাক বিশ্বকে ধ্বংস করে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম এবং পরে পুনরায় সেই কণাসমূহকে একত্রিত করে একেবারে নতুন অবস্থায় জীবিত করে হিসাব–নিকাশের পর পুরস্কার কিংবা শাস্তির আইন–জারী করবেন (আর এটাই বিবেক ও জ্ঞানের চাহিদা)।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا এখানে ضياء এবং

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُونَ ⑦ أُولٰٓئِكَ
مَأْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑧ إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهٰرُ فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ ⑨ دَعْوٰىهُمْ فِيهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ
تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِينَ ⑩ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ
لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑪ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا
لِجَنْبِهٖٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ
كَأَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ إِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑫ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوا
لِيُؤْمِنُوا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ⑬ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ
خَلٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ⑭

(৭) অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নির্দশনসমূহ সম্পর্কে বেখবর (৮) এমন লোকদের ঠিকানা হল আগুন সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল। (৯) অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন তাদের পালনকর্তা, তাদের ঈমানের মাধ্যমে। এমন সুসময় কাননকুঞ্জের প্রতি যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ (১০) সেখানে তাদের প্রার্থনা হল 'পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ্' । আর শুভেচ্ছা হল সালাম আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্রজন্য' বলে।

(১১) আর যদি আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে যথাশীঘ্র অকল্যাণ পৌঁছে দেন যতশীঘ্র তার কামনা করে, তাহলে তাদের আশাই শেষ করে দিতে হত। সুতরাং যাদের মনে আমার সাক্ষাতের আশা নেই, আমি তাদেরকে তাদের দুষ্টামীতে ব্যতিব্যস্ত ছেড়ে দিয়ে রাখি। (১২) আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায়, তখন মনে হয়, কখনো কোন কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে মনঃপূত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে। (১৩) অবশ্য তোমাদের পূর্বে বহু দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন তারা জালেম হয়ে গেছে। অথচ রসূল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনল না। এমনিভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাপী সম্প্রদায়কে। (১৪) অতঃপর আমি তোমাদেরকে যমীনে তাদের পর প্রতিনিধি বানিয়েছি যাতে দেখতে পারি তোমরা কি কর।

نور উভয়টির অর্থই জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্য।

সে জন্যই বিশিষ্ট অভিধানবিদগণ এ দু'টি শব্দকে একই অর্থবোধক শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা যমখ্শরী এবং তায়েবী প্রমুখ বলেছেন যে, যদিও উভয় শব্দের মাঝেই জ্যোতি অর্থ বিদ্যমান, তথাপি نور শব্দটি ব্যাপক। দুর্বল সবল, ক্ষীণ-তীক্ষ্ম যে কোন জ্যোতিকেই নুর বলা যায়। কিন্তু ضوء এবং ضياء যে আলোতে তীক্ষ্মতা বিদ্যমান শুধু তাকেই বলা হয়। আর মানুষের উভয় রকমের আলোরই প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ কাজকর্মের জন্য দিনের প্রখর আলোর প্রয়োজন, আর ছোট ছোট কাজের জন্য রাতের ক্ষীণ আলোই বেশী পছন্দনীয়। যদি দিনের বেলায়ও শুধু চাঁদের অনুজ্জ্বল আলোই থাকতো, তাহলে কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতো। পক্ষান্তরে যদি রাতেও সূর্যের তীক্ষ্ম আলো থাকতো, তাহলে ঘুম এবং রাতের উপযুক্ত কাজে অসুবিধা হতো। কাজেই আল্লাহ্ পাক দু'ধরনের আলোর ব্যবস্থাই এমনভাবে করেছেন যে, সূর্যের আলোকে ضوء (যাও) এবং ضِيَآءً (যিয়া)-এর পর্যায়ে রেখেছেন। কাজকর্মের সময়ে তারই বিকাশের ব্যবস্থা করেছেন। আর চাঁদকে হাল্কা এবং মৃদু আলো দিয়ে বানিয়েছেন এবং রাতে তার প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। সূর্য এবং চাঁদের আলোর পার্থক্যের কথা কোরআন একাধিক জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে।

সূর্য ও চন্দ্রের পরিচালনা ব্যবস্থার মাঝে স্রষ্টার মহান নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে আরেকটি নির্দশন হচ্ছে— وَقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ - قدر শব্দটি تقدير শব্দ থেকে ঘটিত। تقدير অর্থ হল কোন বস্তুকে স্থান কাল অথবা গুণাবলী অনুযায়ী একটা বিশেষ পরিমাণের উপর স্থাপন করা।

مَنَازِلَ শব্দটি منزل এর বহুবচণ। এর প্রকৃত অর্থ নাযিল হওয়ার জায়গা। আল্লাহ্ পাক চন্দ্র-সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার প্রত্যেকটিকেই একেক منزل বলা হয়। চাঁদ যেহেতু প্রতি মাসে তার নিজস্ব পরিক্রমণ সমাপ্ত করে ফেলে, সেহেতু তার মনযিল হল ত্রিশ অথবা উনত্রিশটি। অথবা যেহেতু চাঁদ প্রতিমাসে কমপক্ষে একদিন লুক্কায়িত থাকে সেজন্যে সাধারণতঃ চাঁদের মনযিল আটশটি বলা হয়। আর সূর্যের পরিক্রমণ বছরান্তে পূর্ণ হয় বলে তার মনযিল হল তিনশ' ষাট অথবা পয়ষট্টি। আরবের প্রাচীন জাহেলিয়াত যুগে এবং জ্যোতির্বিদদের মতেও এই মনযিলগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম সেসব নক্ষত্রের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে যেগুলো সেসব মনযিলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। কোরআন করীম এ সমস্ত প্রচলিত নামের বহু উর্ধ্বে। বস্তুতঃ কোরআনের উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র ঐটুকু দূরত্ব বোঝানো, যা চন্দ্র-সূর্য বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে অতিক্রম করে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি-নৈপুণ্যের বিশেষ বিশেষ প্রকাশক্ষেত্র আসমান-যমীন ও চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করে তওহীদ ও আখেরাতের আকীদা ও বিশ্বাসকে এক 'সালঙ্কার ভঙ্গিতে প্রমাণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম তিনটিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব-জাহানের এমন মুক্ত, পরিচ্ছন্ন, নিদর্শন ও প্রমাণসমূহের পরে মানবকুল দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। (এক) সে শ্রেণী যারা কুদরতের এসব নিদর্শনের প্রতি আদৌ

মনোনিবেশ করেনি। না চিনেছে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা মালিককে, না এ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করেছে যে, আমরা দুনিয়ার সাধারণ জীব-জন্তুর মতই কোন জীব নই, আল্লাহ্ তাআলা যখন আমাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তু অপেক্ষা বহুগুণ বেশী চেতনানুভূতি ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকে যখন আমাদেরই সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, তখন হয়তোবা আমাদের প্রতিও কিছু দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে থাকবেন এবং সে সবের জন্য হিসাব-নিকাশ দিতে হবে আর সেজন্য একটা হিসাবের দিন বা প্রতিদান দিবসেরও প্রয়োজন। কোরআনের পরিভাষায় যাকে কেয়ামত ও হাশর-নশর বলে অভিহিত করা হয়েছে। বরং তারা নিজেদের জীবনকে সাধারণ জীব-জানোয়ারের পর্যায়েই রেখে দিয়েছে। প্রথম দুই আয়াতে এ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের পরকালীন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—'আমার নিকট আসার ব্যাপারে যেসব লোকের মনে কোন ধারণা-কল্পনাও নেই, তাদের অবস্থা হল এই যে, তারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন ও তার অনন্ত অসীম সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।'

দ্বিতীয়তঃ 'পৃথিবীতে তারা এমন নিশ্চিত হয়ে বসেছে যেন এখান থেকে আর কোথাও যেতেই হবে না; চিরকালই যেন এখানে থাকবে। কখনোও তাদের একথা মনে হয় না যে, এ পৃথিবী থেকে প্রত্যেকটি লোকের বিদায় নেয়া এমন বাস্তব বিষয় যে, এতে কখনো কোন সন্দেহ হতে পারে না। তাছাড়া এখান থেকে নিশ্চিতই যখন যেতে হবে, তখন যেখানে যেতে হবে, সেখানকার জন্যও তো খানিকটা প্রস্তুতি নেয়া কর্তব্য ছিল।'

তৃতীয়তঃ ''এসব লোক আমার নিদর্শনাবলী ও আয়াতসমূহের প্রতি ক্রমাগত গাফেলতী করে চলেছে। এরা যদি আসমান-যমীন কিংবা এ দুয়ের মধ্যবর্তী সাধারণ সৃষ্টি অথবা, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটুও চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া কঠিন হত না এবং তাতে করে তারা এহেন মূর্খজনোচিত গাফেলতীর গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারত।''

এ সমস্ত লোক যাদের এসব লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে আখেরাতে তাদের শাস্তি হল এই যে, এদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন। আর এ শাস্তি স্বয়ং তাদের কৃতকর্মেরই পরিণতি।

পরবর্তী আয়াতে সে সমস্ত ভাগ্যবান লোকদেরও আলোচনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তাআলার কুদরত তথা মহাশক্তির নির্দেশাবলী সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং সেগুলোকে চিনেছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ঈমানের চাহিদা মোতাবেক সৎকর্ম সম্পাদনে নিয়ত নিয়োজিত রয়েছে,

কোরআন করীম সেসব মহান ব্যক্তিদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যে কল্যাণকর প্রতিদান নির্ধারণ করেছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে اولئك يهديهم ربهم অর্থাৎ, তাঁদের পরওয়ারদেগার তাঁদেরকে তাঁদের ঈমানের কারণে মনযিলে-মকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন যেখানে সুখ ও শান্তিময় কাননকুঞ্জে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে।

এতে 'হেদায়েত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত অর্থ হল পথপ্রদর্শন এবং রাস্তা দেখানো। আবার কখনো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। আর মনযিলে-মকসূদে বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলতে জান্নাতকে বোঝানো হয়েছে যার বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী শব্দে। প্রথম শ্রেণীর লোকদের শাস্তি যেমন তাদের কৃতকর্মের জন্য ছিল, তেমনিভাবে দ্বিতীয় এই মুমিন প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই উত্তম প্রতিদান তাঁরা তাঁদের ঈমানের জন্য পাবেন। আর যেহেতু ঈমানের সাথে সাথে সৎকর্মের কথাও আলোচিত হয়েছে কাজেই এখানে ঈমান বলতে সে ঈমানকেই উদ্দেশ করা হয়েছে, যার সাথে সৎকর্মও বিদ্যমান থাকবে। ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিদানই ছিল সুখ-শান্তির আলয় জান্নাত।

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ এখানে دعوى শব্দটি তার নির্ধারিত দাবী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি যা কোন বাদী তার প্রতি পক্ষের বিরুদ্ধে করে থাকে, বরং এখানে دعوى অর্থ হল দোয়া। সুতরাং এর মর্মার্থ হল এই যে, জান্নাতে পৌছার পর জান্নাতবাসীদের দোয়া বা প্রার্থনা হবে এই যে, তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' অর্থাৎ, তাঁরা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকবেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সাধারণ পরিভাষায় তো 'দোয়া' বলা হয় কোন বিষয়ের আবেদন এবং কোন উদ্দেশ্য যাত্রা করাকে, কিন্তু سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ সুবহানাকাল্লাহুম্মা-তে কোন আবেদন কিংবা কোন কিছুর প্রার্থনা, নেই একে দোয়া বলা যায় কেমন করে?

এর উত্তর এই যে, এ বাক্যের দ্বারা এ কথাই বোঝানো উদ্দেশ্য যে, জান্নাতাবাসীরা জান্নাতে যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও যাবতীয় চাহিদা সতস্ফূর্তভাবে পেতে থাকবেন; কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে কিংবা চাইতে হবে না। কাজেই বাসনা-প্রার্থনা ও প্রচলিত দোয়ার অনুরূপ বাক্য তাদের মুখে আবৃত্ত হতে থাকবে। অবশ্য তাও পার্থিব জীবনের মত অবশ্যকরণীয় কোন এবাদত হিসাবে নয়, বরং তারা এ বাক্যের জপ করে স্বাদানুভব করবেন এবং সানন্দ চিত্তে সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলতে থাকবেন। এছাড়া এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'যে বান্দা আমার প্রশংসাকীর্তনে সতত নিয়োজিত থাকে এবং এমনকি নিজের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করার সময় পর্যন্ত তার থাকে না, আমি তাকে সমস্ত প্রার্থনাকারী অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করব, বিনা প্রার্থনায় তার যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে দেব।' এ হিসাবেও সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটিকে দোয়া বলা যেতে পারে।

এ অর্থেই বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর সামনে যখনই কোন কষ্ট কিংবা পেরেশানী উপস্থিত হত, তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন।

لا اله الا الله العظيم الحليم - لا اله الا الله رب العرش العظيم - لا اله الا الله رب السمٰوات والارض ورب العرش الكريم -

আর ইমাম তারাবী বলেছেন যে, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ একে 'দোয়ায়ে কারব' তথা বিপদের দোয়া বলে অভিহিত করতেন এবং যে কোন বিপদাপদ ও মানসিক পেরেশানীর সময় এ বাক্যগুলো পড়ে দোয়া-প্রার্থনা করতেন।—(তফসীরে কুরতুবী)

ইমাম ইবনে জরীর ও ইবনে মানযার প্রমুখ এমন এক রেওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন যে, জান্নাতবাসীদের যখন কোন জিনিসের প্রয়োজন কিংবা বাসনা হবে, তখন তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বলবেন এবং এ

...টি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাগণ তাদের আরাধ্য বস্তু এনে উপস্থিত দেবেন। 'বস্তুতঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটি যেন জান্নাতবাসীদের পরিভাষা হবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের বাসনা প্রকাশ করে বেন আর ফেরেশতাগণ প্রতিবারই তা পূরণ করে দেবেন।— (রূহুল মা'আনী, কুরতুবী) সুতরাং এ হিসাবেও 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বাক্যটিকে ... বলা যেতে পারে।

জান্নাতবাসীদের দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ প্রচলিত অর্থে تحية বলা হয় এমন শব্দ বা বাক্যকে যার ...মে কোন আগন্তুক কিংবা অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। ...ই, যেমন, সালাম স্বাগতম, খোশ আমদেদ, কিংবা আহ্‌লান ওয়া ...লান প্রভৃতি। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ...আলা অথবা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদেরকে سلام –এর ...ধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। অর্থাৎ, এ সুসংবাদ দেয়া হবে যে, ...মরা যে কোন রকম কষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হেফাজতে ...বে। এ সালাম স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেও হতে পারে। ...ন, সূরা ইয়াসীনে রয়েছে— سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ আবার ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُم অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ প্রতিটি দরজা দিয়ে 'সালামুন আলাইকুম' বলতে বলতে জান্নাতবাসীদের কাছে আসতে থাকবেন। আর এ দু'টি বিষয়ে বিরোধ-বৈপরিত্ব নেই যে, কখনো সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এবং কখনো ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাম আসবে। সালাম শব্দটি যদিও পৃথিবীতে দোয়া হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জান্নাতে পৌছে যখন যাবতীয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাবে, তখন এ বাক্যটি দোয়ার পরিবর্তে সুসংবাদের বাক্য হিসেবে ব্যবহার হবে।— (রূহুল মা'আনী)

জান্নাতবাসীদের তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ, জান্নাতবাসীদের সর্বশেষ দোয়া হবে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পৌছার পর আল্লাহ্ তাআলার মা'রেফাত বা পরিচয়ের ক্ষেত্রে (বিপুল) উন্নতি লাভ করবে। যেমন, হযরত শিহাব উদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী (রহঃ) তাঁর এক পুস্তিকায় বলেছেন যে, জান্নাতে পৌছে সাধারণ জান্নাতবাসীদের জ্ঞান ও মা'রেফাতের এমন স্তর লাভ হবে, যেমন পার্থিব জীবনে ওলামাদের হয়ে থাকে। আর ওলামাগণ সে স্তরে উন্নীত হবেন, যা এখানে নবী রসূলগণের হত। আর নবী-রসূলগণ সে স্তর প্রাপ্ত হবেন, যা পৃথিবীতে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) পেয়েছিলেন। হয়তো বা এই স্তরের নামই হবে 'মাকামে মাহমুদ' যার জন্য আযানের পর তিনি দোয়া করতে বলেছেন।

সারকথা হল এই যে, জান্নাতবাসীদের প্রাথমিক দোয়া হবে سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ আর সর্বশেষ দোয়া হবে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গুণ-বৈশিষ্ট্যের দু'টি প্রকারভেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি 'সিফাতে জালালী' তথা পরাক্রম ও মহত্ব গুণ যাতে যাবতীয় দোষত্রুটি হতে আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতার কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি হল 'সিফাতে করম' যাতে তাঁর মহানুভবতা, পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। কোরআন করীমের تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ আয়াতে এতদুভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সুবহানত্ব' আল্লাহ্ তাআলার জালালী গুণের অন্তর্ভুক্ত। আর তা'রীফ প্রশংসার অধিকারী হওয়া মহানুভবতা সংক্রান্ত গুণের অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিক বিন্যাস অনুযায়ী জালালী বৈশিষ্ট্য করুণা ও মহানুভবতা গুণের অগ্রবর্তী। সে কারণেই জান্নাতবাসীরা প্রথমে তাঁর জালালী গুণ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ বাক্যে বর্ণনা করবেন এবং সর্বশেষে মহানুভবতা গুণ প্রকাশ করবেন الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে। আর এই হবে তাঁদের রাত-দিনের কর্ম।

এ তিনটি আয়াতের স্বাভাবিক ক্রমবিন্যাস হচ্ছে এই যে, জান্নাতবাসীরা যখন سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ বলবেন, তখন এর উত্তরে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম দেয়া হবে এবং এর ফলে তারা الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলবেন।— (রুহুল-মা'আনী)

দোয়া প্রার্থনাকারীর পক্ষে দোয়া শেষে واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين বলা মুস্তাহাব। এতদসঙ্গে সূরা সাফ্‌ফাতের শেষ আয়াতগুলো অর্থাৎ, سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ - وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পড়ে নেয়া অধিকতর উত্তম।

উল্লেখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথমটির সম্বন্ধ সেসব লোকের সাথে যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী। সে জন্যই যখন তাদেরকে আখেরাতের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তখন বিদ্রূপচ্ছলে বলতে থাকে যে, যদি তুমি সত্যবাদীই হয়ে থাক, তবে এখনই এ আযাব ডেকে আন। অথবা বলে, যদি তুমি সত্যবাদীই হয়ে থাক, অথবা বলে, এ আযাব শীঘ্র কেন আসে না? যেমন, নযর ইবনে হারেস বলেছিলঃ 'আয় আল্লাহ্, একথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আকাশ থেকে অমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন কিংবা এর চেয়েও কোন কঠিন আযাব পাঠিয়ে দিন।'

১১ নং আয়াতে এরই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়েই ক্ষমতাশীল, প্রতিশ্রুত সে আযাব এক্ষণেই নাযিল করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর মহান হেকমত ও দয়া-করুণার দরুন এ মূর্খরা নিজের জন্য যে বদ্‌দোয়া করে এবং বিপদ ও অকল্যাণ কামনা করে তা নাযিল করেন না। যদি আল্লাহ্ তাআলা তাদের বদদোয়াগুলোও তেমনিভাবে যথাশীঘ্র কবুল করে নিতেন, যেভাবে তাদের ভাল দোয়াগুলো কবুল করেন, তাহলে এরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভ দোয়া-প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় তিনি সেগুলো শীঘ্র কবুল করে নেন। অবশ্য কখনো কোন হেকমত ও কল্যাণের কারণে কবুল না হওয়া এর পরিপন্থী নয়। কিন্তু মানুষ যে কখনো নিজেদের অজান্তে এবং কখনো দুঃখ-কষ্ট ও রাগের বশে নিজের কিংবা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য বদদোয়া করে বসে, অথবা আখেরাতের প্রতি অস্বীকৃতির দরুন আযাবকে প্রহসন মনে করে নিজের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে সেগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন না; বরং অবকাশ দেন, যাতে অস্বীকারকারীরা বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং কোন সাময়িক দুঃখ-কষ্ট, রাগ-রোষ কিংবা যদি মনোবেদনার কারণে বদদোয়া করে বসে, তাহলে সে

যেন নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ লক্ষ্য করে, তার পরিণতি বিবেচনা করে তা থেকে বিরত হবার অবকাশ পেতে পারে।

ইমাম জরীর তাবারী (রহঃ) কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর রেওয়াতেক্রমে এবং বোখারী ও মুসলিম মুজাহিদ (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করছেন যে, এক্ষেত্রে বদদোয়ার মর্ম এই যে, কোন কোন সময় কেউ কেউ রাগতঃ নিজের সন্তান-সন্ততি কিংবা অর্থ-সম্পদ ধ্বংসের বদদোয়া করে বসে কিংবা বস্তু-সামগ্রীর প্রতি অভিসম্পাত করতে আরম্ভ করে—আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় করুণা ও মহানুভবতাবশতঃ সহসাই এসব দোয়া কবুল করেন না। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ 'আমি আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা জানিয়েছি, যেন তিনি কোন বন্ধু-স্বজনের বদদোয়া তার বন্ধু-স্বজনের ব্যাপারে কবুল না করেন।' আর শাহ্র ইবনে হাওশাব (রহঃ) বলেছেন, আমি কোন কোন কিতাবে পড়েছি, যেসব ফেরেশতা মানুষের প্রয়োজন সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণায় তাদেরকে এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে, আমার বন্দা দুঃখ-কষ্টের দরুন কিংবা রাগবশতঃ কোন কথা বলে ফেললে তা লিখবে না।—(কুরতুবী)

তারপরেও কোন কোন সময় এমন কবুলিয়ত বা মঞ্জুরীর সময় আসে, যখন মানুষের মুখ থেকে যে কোন কথা বের হয়, তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে যায়। সেইজন্য রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, নিজের সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-সম্পদের জন্য কখনো বদদোয়া করো না। এমন যেন না হয় যে, সে সময়টি হয় মঞ্জুরীর সময় এবং দোয়া সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়। আর পরে তোমাদেরকে অনুতাপ করতে হয়। সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়াতেক্রমে গযওয়ায়ে 'বাওয়াত'-এর ঘটনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে একত্ববাদ ও আখেরাত অস্বীকারকারী লোকদেরকে আরেক অপরূপ সালঙ্কার ভঙ্গিতে স্বীকার করানো হয়েছে। তাহল এই যে, সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় এরা আল্লাহ্ ও আখেরাতের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়, অন্যান্যদেরকে আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করে এবং তাদেরই কাছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করে, কিন্তু যখন কোন বিপদে পড়ে তখন এরা নিজেরাও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত লক্ষ্যস্থলের প্রতি নিরাশ হয়ে গিয়ে শুধু আল্লাহ্কেই ডাকতে আরম্ভ করে। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় একমাত্র তাঁকেই ডাকতে বাধ্য হয়। অথচ তাঁরই সাথে তাদের অনুগ্রহ বিমুখতার অবস্থা হল এই যে, যখনই আল্লাহ্ তাআলা তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখনই আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারে এমন মুক্ত-নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, যেন কখনো তাঁকে ডাকেইনি, তার কাছে যেন কোন বাসনাই প্রার্থনা করেনি। এতে বোঝা যাচ্ছে, মানুষের বাসনা পূরণ আল্লাহ্ তাআলার সাথে যারা অপর কাউকে শরীক করে তারা নিজেও তাদের সে বিশ্বাসের অসারতা, উপলব্ধি করে কিন্তু একান্ত বিদ্বেষ ও জেদের বশেই সে বাতিল বিশ্বাসে অটল থাকে।

তৃতীয় আয়াতে ও দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কেউ যেন আল্লাহ্ তাআলার অবকাশ দানের কারণে এমন ধারণা করে না বসে যে, পৃথিবীতে আযাব আসতেই পারে না। বিগত জাতি-সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং তাদের ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার সাক্ষিস্বরূপ বিভিন্ন রকম আযাব এ পৃথিবীতেই এসে গেছে। আল্লাহ্ তাআলা নবীকুল শিরমণি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দৌলতে এ ওয়াদা করে নিয়েছেন যে, কোন সাধারণ ব্যাপক আযাব এ উম্মতের উপর আসবে না। ফলে আল্লাহ্ তাআলার এহেন করুণা, অনুগ্রহ এসব লোককে এমন নির্ভয় করে দিয়েছে যে, তারা একান্ত দুঃসাহসের সাথে আল্লাহ্র আযাবকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং তার দাবী করতে তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তাআলার আযাব সম্পর্কে এ নিশ্চিন্ততা কোন অবস্থাতেই তাদের জন্য সমীচীন ও কল্যাণকর নয়। কারণ, গোটা উম্মত এবং সমগ্র বিশ্বের উপর ব্যাপক আযাব না পাঠাবার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর আযাব নেমে আসা অসম্ভব নয়।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ, অতঃপর পূর্ববর্তী জাতি-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছি এবং পৃথিবীর খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব তোমাদের হাতে অর্পণ করে দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করো না যে, পৃথিবীর খেলাফত (শুধু) তোমাদের ভোগ-বিলাসের জন্যই তোমাদের হাতে অর্পন করা হয়েছে। বরং এই মর্যাদা ও সম্মান দানের পেছনে আসল উদ্দেশ্য হল তোমাদের পরীক্ষা নেয়া যে, তোমরা কেমন কার্যকলাপ অবলম্বন কর—বিগত উম্মতদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থার সংশোধন কর, নাকি রাষ্ট্র ও ধন-দৌলতের নেশায় উন্মত্ত হয়ে পড়।

এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন গর্ব-অহংকারের বিষয় নয়; বরং একটি ভারী বোঝা, যাতে রয়েছে বহুদায়-দায়িত্ব।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي
أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ
إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ
فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ
أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ
إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُونَ
لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا
الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۖ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

(১৫) আর যখন তাদের কাছে আমার প্রকৃষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে সমস্ত লোক বলে, যাদের আশা নেই আমার সাক্ষাতের, নিয়ে এসো কোন কোরআন এটি ছাড়া, অথবা একে পরিবর্তিত করে দাও। তাহলে বলে দাও, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করা আমার কাজ নয়। আমি সে নির্দেশেরই আনুগত্য করি, যা আমার কাছে আসে। আমি যদি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নাফরমানী করি, তবে কঠিন দিবসের আযাবের ভয় করি। (১৬) বলে দাও, যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে আমি এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর নাইবা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। কারণ, আমি তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বেও একটা বয়স অতিবাহিত করেছি। তারপরেও কি তোমরা চিন্তা করবে না? (১৭) অতঃপর তার চেয়ে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করছে? কস্মিনকালেও পাপীদের কোন কল্যাণ হয় না। (১৮) আর উপাসনা করে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ্কে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পূত-পবিত্র ও মহান সে সমস্ত, থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ। (১৯) আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে। আর একটি কথা যদি তোমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত না হয়ে যেত; তবে তারা যে বিষয়ে বিরোধ করছে তার মীমাংসা হয়ে যেত। (২০) বস্তুতঃ তারা বলে, তাঁর কাছে তাঁর পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ এল না কেন? বলে দাও, গায়বের কথা আল্লাহ্ই জানেন। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৫ থেকে ১৮ এ চার আয়াতে আখেরাতের প্রতি অস্বীকারকারীদের একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং অন্যায় আবদারের খন্ডন করা হয়েছে। এসব লোক না জানত আল্লাহ্ তাআলার মা'রেফাত, না ওহী ও রেসালত সম্পর্কিত কোন পরিচয়। নবী-রসূলগণকেও সাধারণ মানুষের মত মনে করত। যে কোরআন করীম রসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে পৌঁছেছে তার সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল এই যে, এটি স্বয়ং তাঁরই কালাম, তাঁরই রচনা। এ ধারণার প্রেক্ষিতেই তারা মহানবী (সাঃ)-এর কাছে দাবী জানায় যে, কোরআন এটি তো আমাদের বিশ্বাস ও মতবাদের বিরোধী; যে মূর্তি-বিগ্রহকে আমাদের পিতা-পিতামহ সততঃ সম্মান করে এসেছে এবং এগুলোকে সিদ্ধিদাতা হিসাবে মান্য করে এসেছে, কোরআন সে সমুদয়কে বাতিল ও পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করে। তদুপরি কোরআন আমাদের বলে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এবং সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে। এসব বিষয় আমাদের বুঝে আসে না। আমরা এসব মানতে রাযী নই। সুতরাং হয় আপনি এ কোরআনের পরিবর্তে অন্য কোরআন তৈরী করে দিন যাতে এসব বিষয় থাকবে না, আর না হয় অন্ততঃ এতেই সংশোধন করে সে বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিন।

কোরআন করীম প্রথমে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার লক্ষ্যে মহানবী (সাঃ)-কে হেদায়েত দান করেছে যে, আপনি তাদের বলে দিন ঃ এটি আমার কালামও নয় এবং নিজের ইচ্ছামত আমি এতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধনও করতে পারি না। আমি তো শুধুমাত্র খোদায়ী ওহীর তাবেদার। আমি আমার ইচ্ছামত এতে যদি সামান্যতম পরিবর্তনও করি, তাহলে অতি কঠিন গোনাহগার হয়ে পড়ব এবং নাফরমানদের জন্যে যে আযাব নির্ধারিত রয়েছে, আমি তার ভয় করি। কাজেই আমার পক্ষে এমনটি অসম্ভব।

কাফের ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি-দেশভিত্তিক জাতীয়তা অর্থহীন ঃ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً অর্থাৎ, সমস্ত আদম সন্তান প্রথমে একত্ববাদে বিশ্বাসী একই উম্মত ও একই জাতি ছিল। শিরক ও কুফরের নামও ছিল না। পরে একত্ববাদে মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়।

একই উম্মত এবং সবার মুসলমান থাকার সময়কাল কত দিন এবং কবে ছিল? হাদীস ও সীরাতের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত এমনি অবস্থা ছিল। নূহ (আঃ)-এর যুগে এসেই কুফর ও শেরক আরম্ভ হয়, যার ফলে হযরত নূহ (আঃ)-কে এর মোকাবেলা করতে হয়।—(তফসীরে মাযহারী)

একথাও সুবিদিত যে, হযরত আদম থেকে হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ সময়ে পৃথিবীতে মানব বংশ ও জনপদ যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ সমুদয় মানুষের মাঝে বর্ণ ও আকার-অবয়ব এবং জীবন ধারণ পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রগত পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও নিশ্চিত। আর হয়তো কথাবার্তায় ভাষাগতও কিছু পার্থক্য হয়ে

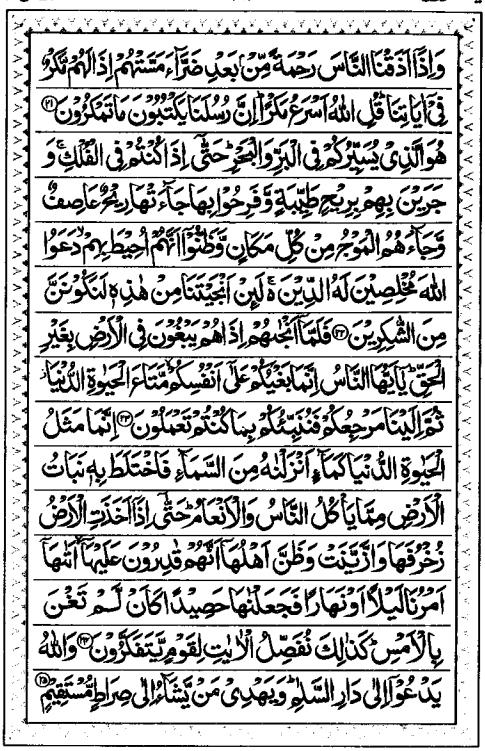

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ
فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾
هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَ
جَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ
وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟
ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ
مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ
ٱلْحَقِّ ۗ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ
ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّمَا مَثَلُ
ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ
ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَٰمُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ
أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ
بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَٱللَّهُ
يَدْعُوٓا۟ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

(২১) আর যখন আমি আস্বাদন করাই স্বীয় রহমত সে কষ্টের পর, যা তাদের ভোগ করতে হয়েছিল, তখনই তারা আমার শক্তিমত্তার মাঝে নানা রকম ছলনা তৈরী করতে আরম্ভ করবে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ সবচেয়ে দ্রুত কলা-কৌশল তৈরী করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতারা লিখে রাখে তোমাদের ছল-চাতুরী। (২২) তিনিই তোমাদের ভ্রমন করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল, নৌকাগুলোর উপর এল তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহ্‌কে তাঁর এবাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে 'যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। (২৩) তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ্ বাঁচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায়ভাবে। হে মানুষ শোন, তোমাদের অনাচার তোমাদেরই উপর পড়বে। পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও—অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে দেব, যাকিছু তোমরা করতে। (২৪) পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, পরে তা মিলিত-সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এল যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য-সুষমায় ভরে উঠল আর যমীনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাত্রে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তূপাকার করে দিল যেন কালও এখানে কোন আবাদ ছিল না। এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শনসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে। (২৫) আর আল্লাহ্ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহ্বান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন।

গিয়েছিল। কিন্তু কোরআন করীম এই বংশগত, অঞ্চলগত, বর্ণগত ও রাষ্ট্রগত পার্থক্যকে যা একান্তই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক—উম্মতের ঐক্যের অন্তরায় বলে সাব্যস্ত করেনি এবং এই পার্থক্যের কারণে আদম সন্তানকে বিভিন্ন জাতি কিংবা বিভিন্ন উম্মতও বলেনি, বরং 'উম্মতেওয়াহেদাহ্' তথা একই জাতি বলে অভিহিত করেছে।

অবশ্য যখন ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরী ও শেরেকী বিস্তার লাভ করে, তখন কাফের ও মুশরিককে পৃথক জাতি, পৃথক সম্প্রদায় সাব্যস্ত করে বলেছে فَاخْتَلَفُوا কোরআন করীমের هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ আয়াত এ বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট আদম সন্তানদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করার বিষয় শুধু ঈমান ও ইসলাম বিমুখতা। বংশগত ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের দরুন জাতিসমূহ পৃথক হয় না। ভাষা, দেশ কিংবা গোত্র-বর্ণের ভিত্তিতে মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায় সাব্যস্ত করা মূর্খতার একটা নয়া দৃষ্টান্ত যা আধুনিক প্রগতির সৃষ্টি। আজকের বহু লেখা-পড়া জানা লোক এই ন্যাশনালিজম তথা জাতীয়তাবাদের পেছনে লেগে আছে। অথচ এরা হাজার রকমের দাঙ্গা বিশৃংখলায় জড়িয়ে রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا আরবী অভিধান অনুসারে مَكْرٌ বলা হয় গোপন পরিকল্পনাকে, যা ভালও হতে পারে এবং মন্দও হতে পারে। উর্দু (কিংবা বাংলা) পরিভাষার দরুন ধোকা খাওয়া উচিত নয় যে, উর্দু (কিংবা বাংলায়) مَكْرٌ বলা হয় ধোকা, প্রতারণা, ফেরেববাজী প্রভৃতি অর্থে, যা থেকে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র।

إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ – অর্থাৎ, তোমাদের অন্যায়-অনাচারের বিপদ তোমাদেরই উপর পড়ছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, জুলুমের কারণে বিপদ অবশ্যম্ভাবী এবং দুনিয়াতেও তা ভোগ করতে হয়।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা আত্মীয়-বাৎসল্য ও অনুগ্রহের বদলাও শীঘ্রই দান করেন। (আখেরাতের পূর্বে পৃথিবীতেই এর বরকত পরিলক্ষিত হতে আরম্ভ করে। তেমনিভাবে) অন্যায় অত্যাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বদলাও শীঘ্রই দান করেন। (দুনিয়াতেই তা ভোগ করতে হয়। এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজা নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।) অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, তিন প্রকার পাপ এমন রয়েছে, যার অশুভ পরিণতি তার কর্তার উপরই পতিত হয়। তা হল জুলুম, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও ধোঁকা-প্রতারণা।—(আবুশ্‌শায়খ ইবনে মারদুবিয়াহ্ কর্তৃক তাঁর তফসীরে বর্ণিত ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।)

وَاللّٰهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে শান্তির আলয়ের দিকে আহবান করেন। অর্থাৎ, এমন গৃহের প্রতি আমন্ত্রণ জানান যাতে রয়েছে সর্ববিধ নিরাপত্তা ও শান্তি। না আছে তাতে কোন রকম দুঃখ-কষ্ট, না আছে ব্যথা-বেদনা, না আছে রোগ-তাপের ভয় আর নাইবা আছে ধ্বংস।

'দারুসসালাম'-এর মর্মার্থ হল জান্নাত। একে 'দারুসসালাম' বলার এক কারণ হল এই যে, প্রত্যেকেই এখানে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও প্রশান্তি

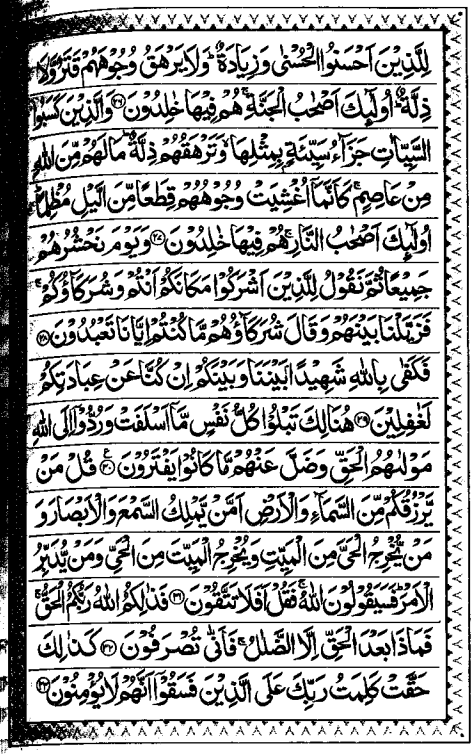

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا
ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا
السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ
جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ
فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾
فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ
لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ
مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾ قُلْ مَنْ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ
مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ
فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ
حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

(২৬) যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশী। আর তাদের মুখমন্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হল জান্নাতবাসী, এতেই তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্তকাল। (২৭) আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ—অসৎ কর্মের বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহ্‌র হাত থেকে। তাদের মুখমন্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে। এরা হল দোযখবাসী। এরা এতেই থাকবে অনন্তকাল। (২৮) আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে সমবেত করব; আর যারা শেরক করত তাদেরকে বলব ঃ তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও—অতঃপর তাদেরকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন করে দেব, তখন তাদের শরীকরা বলবে, তোমরা তো আমাদের উপাসনা-বন্দেগী করনি। (২৯) বস্তুতঃ আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। আমরা তোমাদের বন্দেগী সম্পর্কে জানতাম না। (৩০) সেখানে প্রত্যেকে যাচাই করে নিতে পারবে যাকিছু সে ইতিপূর্বে করেছিল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে যিনি তাদের প্রকৃত মালিক, আর তাদের কাছ থেকে দূরে যেতে থাকবে যারা মিথ্যা বলত। (৩১) তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্! তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছ না? (৩২) অতএব, এ আল্লাহ্ই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্য প্রকাশের পরে (উদ্‌ভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া—সুতরাং কোথায় ঘুরছ? (৩৩) এমনিভাবে সপ্রমাণিত হয়ে গেছে তোমার পরওয়ারদেগারের বাণী সেসব নাফরমানের ব্যাপারে যে, এরা ঈমান আনবেনা।

লাভ করবে। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, জান্নাতের নাম দারুসসালাম এজন্য রাখা হয়েছে যে, এতে বসবাসকারীদের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও সালাম পৌছতে থাকবে। বরং সালাম শব্দই হবে জান্নাতবাসীদের পরিভাষা, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মনোবাসনা ব্যক্ত করবেন এবং ফেরেশতাগণ তা সরবরাহ করে দেবেন। যেমন, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মা'আয (রহঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে নসীহত হিসেবে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ হে আদম সন্তানগণ, তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা দারুসসালামের দিকে আহবান করেছেন, তোমরা এ খোদায়ী আহবানে কবে এবং কোথা থেকে সাড়া দেবে? ভাল করে জেনে রাখ, এ আহবান গ্রহণ করার জন্য যদি তোমরা পৃথিবী থেকেই চেষ্টা করতে আরম্ভ কর, তাহলে সফলকাম হবে এবং তোমরা দারুসসালামে পৌছে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা পার্থিব এ বয়স নষ্ট করার পর মনে কর যে, কবরে পৌছে এই আহবানের প্রতি চলতে আরম্ভ করব, তাহলে তোমাদের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হবে। তখন সেখান থেকে আর এক ধাপও আগাতে পারবে না। কারণ, তা কর্মস্থল নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'দারুসসালাম' হল জান্নাতের সাতটি নামের একটি। – (তফসীরে-কুরতুবী)

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দুনিয়াতে কোন ঘরের নাম 'দারুসসালাম' রাখা সমীচীন নয়। যেমন, জান্নাত কিংবা ফেরদৌস প্রভৃতি নাম রাখা জায়েয নয়।

অতঃপর উল্লেখিত আয়াতে এরশাদ হয়েছে– وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পৌছে দেন।

এর মর্মার্থ হল যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে দারুসসালামের দাওয়াত সমগ্র মানবজাতির জন্যই ব্যাপক। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে হেদায়েতও ব্যাপক। কিন্তু হেদায়েতের বিশেষ প্রকার—সরল-সোজা পথে তুলে দেয়া এবং তাতে চলার তওফীক বিশেষ বিশেষ লোকদের ভাগ্যেই জোটে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ অর্থাৎ, ইনিই হলেন সে মহান সত্তা যাঁর গুণ-পরাকাষ্ঠার বিবরণ এইমাত্র বর্ণিত হল, তারপরে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? অর্থাৎ, যখন আল্লাহ্ তাআলার নিশ্চিত উপাস্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন সে নিশ্চিত সত্যকে পরিহার করে অন্যান্যদের প্রতি মনোনিবেশ করা কঠিন নির্বুদ্ধিতার কাজ।

এ আয়াতের জ্ঞাতব্য বিষয় ও মাসায়েলসমূহের মধ্যে স্মরণ রাখার যোগ্য যে, আয়াতে فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সত্য ও মিথ্যার মাঝে কোন সংযোগ নেই। যা সত্য ও ন্যায় হবে না, তাই মিথ্যা ও পথভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন কোন কাজ থাকতে পারে না, যা না হবে সত্য, না হবে পথভ্রষ্টতা। আবার এমনও হতে পারে না যে, দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুই সত্য হবে। আকায়েদের সমস্ত

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ
يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ
مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَنْ يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ
كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا كَانَ هَٰذَا
الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا
بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾ وَ
مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ
أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

(৩৪) বল, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের মাঝে যে সৃষ্টিকে পয়দা করতে পারে এবং আবার জীবিত করতে পারে? বল, আল্লাহ্ই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং অতঃপর তার পুনরুদ্ভব করবেন। অতএব, কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছ? (৩৫) জিজ্ঞেস কর, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের মধ্যে যে সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? বল, আল্লাহ্ই সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, সুতরাং এমন যে লোক সঠিক পথ দেখাবে তার কথা মান্য করা কিংবা যে লোক নিজে নিজে পথ খুঁজে পায় না, তাকে পথ দেখানো কর্তব্য। অতএব, তোমাদের কি হল, কেমন তোমাদের বিচার? (৩৬) বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না। আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন, তারা যা কিছু করে। (৩৭) আর কোরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে যা তোমার প্রতি দেয়া হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই- তোমার বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে। (৩৮) মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সূরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ্ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (৩৯) কিন্তু কথা হল এই যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে আরম্ভ করেছে যাকে বুঝতে তারা অক্ষম। অথচ এখনো এর বিশ্লেষণ আসেনি। এমনিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা। অতএব, লক্ষ্য করে দেখ, কেমন হয়েছে পরিণতি। (৪০) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোরআনকে বিশ্বাস করবে এবং কেউ কেউ বিশ্বাস করবে না। বস্তুতঃ তোমার পরওয়ারদেগার যথার্থই জানেন দুরাচারদিগকে। (৪১) আর যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে বল, আমার জন্য আমার কর্ম, আর তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের দায়-দায়িত্ব নেই আমার কর্মের উপর এবং আমারও দায়-দায়িত্ব নেই তোমরা যা কর সেজন্য।

নীতিশাস্ত্রে একথা সর্বজন স্বীকৃত। অবশ্য আনুষঙ্গিক মাসআলা-মাসায়েল ও ফেকাহ্ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন মনীষীর মতে ইজতেহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকেই সত্য ও সঠিক বলা হবে। আর অধিকাংশ ওলামা এ ব্যাপারে একমত যে, ইজতেহাদী মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে প্রতিপক্ষকে পথভ্রষ্ট-গোমরাহ্ বলা যাবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ এখানে تاويل এর মর্মার্থ হল প্রতিফল ও শেষ পরিণতি। অর্থাৎ, এরা নিজেদের গাফলতী ও নির্লিপ্ততার দরুন কোরআন সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করেনি। ফলে এর প্রতি মিথ্যারোপে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরই সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং নিজেদের কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি চিরকালের জন্য গলার ফাঁস হয়ে যাবে।

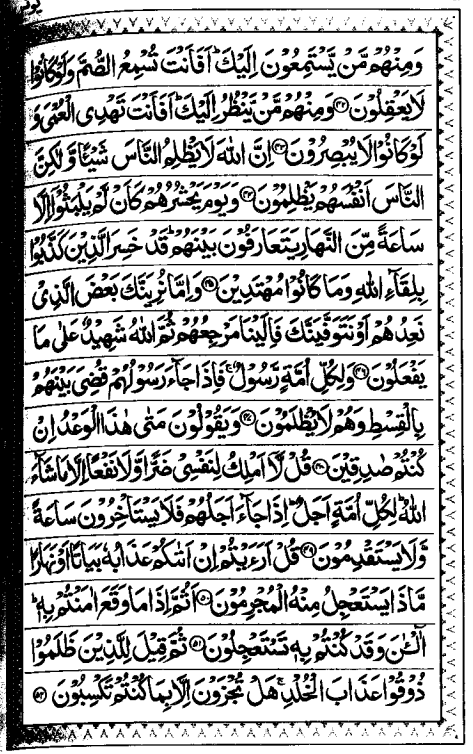

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ۭ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا
لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ۭ اَفَاَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ
كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـــًٔا وَّلٰكِنَّ
النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا
سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ۭ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِلِقَاۗءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ
نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰي مَا
يَفْعَلُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَاۗءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَاۗءَ
اللّٰهُ ۭ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۭ اِذَا جَاۗءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً
وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٤٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا
مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ۭ
اٰلْــٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٥٢﴾

(৪২) তাদের কেউ কেউ কান রাখে তোমাদের প্রতি; তুমি বধিরদেরকে কি শোনাবে যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি না থাকে। (৪৩) আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখে; তুমি অন্ধদেরকে কি পথ দেখাবে যদি তারা মোটেও দেখতে না পারে। (৪৪) আল্লাহ্ জুলুম করেন না মানুষের উপর, বরং মানুষ নিজেই নিজের উপর জুলুম করে। (৪৫) আর যেদিন তাদেরকে সমবেত করা হবে, যেন তারা অবস্থান করেনি, তবে দিনের একদণ্ড। একজন অপরজনকে চিনবে। নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতকে এবং সরলপথে আসেনি। (৪৬) আর যদি আমি দেখাই তোমাকে সে ওয়াদাসমূহের মধ্য থেকে কোন কিছু যা আমি তাদের সাথে করেছি, অথবা তোমাকে মৃত্যুদান করি, যাহোক, আমার কাছেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সে সমস্ত কর্মের সাক্ষী যা তারা করে। (৪৭) আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একেকজন রসূল রয়েছে। যখন তাদের কাছে তাদের রসূল ন্যায়দণ্ডসহ উপস্থিত হল, তখন আর তাদের উপর জুলুম হয় না। (৪৮) তারা আরো বলে, এ ওয়াদা কবে আসবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? (৪৯) তুমি বল, আমি আমার নিজের ক্ষতি কিংবা লাভেরও মালিক নই, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই একেকটি ওয়াদা রয়েছে, যখন তাদের সে ওয়াদা এসে পৌঁছে যাবে, তখন না একদণ্ড পেছনে সরতে পারবে, না সামনে ফসকাতে পারবে,। (৫০) তুমি বল, আচ্ছা দেখ তো দেখি, যদি তোমাদের উপর তাঁর আযাব রাতারাতি অথবা দিনের বেলায় এসে পৌঁছে যায়, তবে এর আগে পাপীরা কি করবে? (৫১) তাহলে কি আযাব সংঘটিত হয়ে যাবার পর এর প্রতি বিশ্বাস করবে? এখন স্বীকার করলে? অথচ তোমরা এরই তাকাদা করতে? (৫২) অতঃপর বলা হবে, গোনাহগারদিগকে, ভোগ করতে থাক অনন্ত আযাব- তোমরা যা কিছু করতে তার তাই প্রতিফল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ, কেয়ামতে যখন মৃতদেহকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন একে অপরকে চিনতে পারবে এবং মনে হবে দেখা-সাক্ষাত হয়নি তা যেন খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়।

ইমাম বগভী (রহঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, এ পরিচয় হবে প্রথমদিকে। পরে কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী সামনে চলে আসলে পর এসব পরিচয় ছিন্ন হয়ে যাবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তখনো পরিচয় থাকবে, কিন্তু ভয়-সন্ত্রাসের দরুন কথা বলতে পারবে না। -(মাযহারী)

اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ۭ اٰلْــٰٔنَ অর্থাৎ, তোমরা কি তখন ঈমান আনবে, যখন তোমাদের উপর আযাব পতিত হয়ে যাবে? চাই তা মৃত্যুর সময়েই হোক কিংবা তার পূর্বে। কিন্তু তখন তোমাদের ঈমানের উত্তরে কি বলা হবে- اٰلْــٰٔنَ এতক্ষণে ঈমান আনলে, যখন ঈমানের সময় চলে গেছে? যেমন, জলমগ্ন হবার সময়ে ফেরাউন যখন বলল, اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَاۗءِيْلَ (অর্থাৎ, আমি ঈমান আনছি, নিশ্চয়ই কোন উপাস্য নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈলরা।) উত্তরে বলা হয়েছিল— اٰلْــٰٔنَ (অর্থাৎ, এতক্ষণে ঈমান আনলে?) বস্তুতঃ তার ঈমান কবুল করা হয়নি। এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বন্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুকালীন ঊর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। অর্থাৎ, মৃত্যুকালীন গরগরা বা ঊর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যাবার পর ঈমান ও তওবা আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে দুনিয়াতে আযাব সংঘটিত হওয়ার পূর্বাহ্নে তওবা কবুল হতে পারে। কিন্তু আযাব এসে যাবার পর আর তওবা কবুল হয় না। সূরার শেষাংশে ইউনুস (আঃ)-এর কওমের যে ঘটনা আসছে যে, তাদের তওবা কবুল করে নেয়া হয়েছিল,তা এই মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল। কারণ, তারা দূরে থেকে আযাব আসতে দেখেই বিশুদ্ধ-সত্য মনে কেঁদে-কেটে তওবা করে নিয়েছিল। তাই আযাব সরে যায়। যদি আযাব তাদের উপর পতিত হয়ে যেত, তবে আর তওবা কবুল হত না।

وَيَسْتَنْبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۝٥٣
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ
لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝٥٤ أَلَآ
إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٥٥ هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝٥٦ يَٰٓأَيُّهَا
ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝٥٧ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ
فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝٥٨ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ
ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ
لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۝٥٩ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ
ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝٦٠ وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن
قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ
فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا
فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ۝٦١

(৫৩) আর তোমার কাছে সংবাদ জিজ্ঞেস করে, এটা কি সত্য? বলে দাও, অবশ্যই আমার পরওয়ারদেগারের কসম এটা সত্য। আর তোমরা পরিশ্রান্ত করে দিতে পারবে না। (৫৪) বস্তুতঃ যদি প্রত্যেক গোনাহগারের কাছে এত পরিমাণ থাকে যা আছে সমগ্র যমীনের মাঝে, আর অবশ্যই যদি সেগুলো নিজের মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাইবে আর গোপনে গোপনে অনুতাপ করবে, যখন আযাব দেখবে। বস্তুতঃ তাদের জন্য সিদ্ধান্ত হবে ন্যায়সঙ্গত এবং তাদের উপর জুলুম হবে না। (৫৫) শুনে রাখ, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহ্‌র। শুনে রাখ, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তবে অনেকেই জানে না। (৫৬) তিনিই জীবন ও মরণ দান করেন এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৫৭) হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য। (৫৮) বল, আল্লাহ্‌র দয়া ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছ। (৫৯) বল, আচ্ছা নিজেই লক্ষ্য করে দেখ, যা কিছু আল্লাহ্ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোন্‌টাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বল, তোমাদের কি আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ আরোপ করছ? (৬০) আর আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের কি ধারণা কেয়ামত সম্পর্কে? আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহই করেন, কিন্তু অনেকেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (৬১) বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কোরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও যমীনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে কোরআন করীমের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে— (এক) مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ – مَوْعِظَةٌ ও وعظ এর প্রকৃত অর্থ হল এমন বিষয় বর্ণনা করা, যা শুনে মানুষের অন্তর কোমল হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি প্রণত হয়ে পড়ে। পার্থিব গাফলতীর পর্দা ছিন্ন হয়ে মনে আখেরাতের ভাবনা উদয় হয়। কোরআন করীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই 'মাওয়ায়েযে হাসনাহ্'–এর অত্যন্ত সালঙ্কার প্রচারক। এর প্রতিটি জায়গায় ওয়াদা–প্রতিশ্রুতির সাথে সাথে ভীতি–প্রদর্শন, সওয়াবের সাথে সাথে আযাব, পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও কৃতকার্যতার সাথে সাথে ব্যর্থতা ও পথভ্রষ্টতা প্রভৃতির এমন সংমিশ্রিত আলোচনা করা হয়েছে, যা শোনার পর পাথরও পানি হয়ে যেতে পারে। তদুপরি কোরআন করীমের অন্যান্য বর্ণনা–বিশ্লেষণও এমন যা মনের পটপরিবর্তন করে দিতে অদ্বিতীয়।

مَّوْعِظَةٌ এর সাথে مِّن رَّبِّكُمْ বলে কোরআনী–ওয়াযের মর্যাদাকে অধিকতর উচ্চ করে দিয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ ওয়ায নিজেদেরই মত কোন দুর্বল মানুষের পক্ষ থেকে নয় যার হাতে কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি, কিংবা পাপ–পুণ্য কিছু নেই; বরং এ হলো মহান পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে, যার কোথাও ভুল–ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই এবং যার প্রতিজ্ঞা–প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শনে কোন দুর্বলতা কিংবা আপত্তি ওযরের আশংকা নেই।

কোরআন করীমের দ্বিতীয় গুণ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। وَشِفَآءٌ অর্থ রোগ নিরাময় হওয়া আর صدور হল صدر এর বহুবচন, যার অর্থ বুক। আর এর মর্মার্থ অন্তর।

সারার্থ হচ্ছে যে, কোরআন করীম অন্তরের ব্যাধিসমূহের জন্য একান্ত সফল চিকিৎসা ও সুস্থতা এবং রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন যে, কোরআনের এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, এটি বিশেষতঃ অন্তরের রোগের শেফা; দৈহিক রোগের চিকিৎসা নয়।—(রূহুল–মা'আনী)

কিন্তু অন্যান্য মনীষীবৃন্দ বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে কোরআন সর্ব রোগের নিরাময়, তা অন্তরের রোগই হোক কিংবা দেহেরই হোক। তবে আত্মিক রোগের ধ্বংসকারিতা মানুষের দৈহিক রোগ অপেক্ষা বেশী মারাত্মক এবং এর চিকিৎসাও যে কারো সাধ্যের ব্যাপার নয়। সে কারণেই এখানে শুধু আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, দৈহিক রোগের জন্য এটি চিকিৎসা নয়।

হাদীসের বর্ণনা ও উম্মতের আলেম সম্প্রদায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ যে, কোরআন করীম যেমন আন্তরিক ব্যাধির জন্য অব্যর্থ মহৌষধ, তেমনি দৈহিক রোগ–ব্যাধির জন্যও উত্তম চিকিৎসা।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)–এর খেদমতে এসে নিবেদন করল যে, আমার বুকে কষ্ট পাচ্ছি। মহানবী (সাঃ) বললেন, কোরআন পাঠ কর। কারণ আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন— وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ অর্থাৎ কোরআন সে সমস্ত রোগের জন্য আরোগ্য যা বুকের মাঝে হয়ে থাকে।—(রূহুল মা'আনী–ইবনে মার্দুবিয়াহ থেকে)

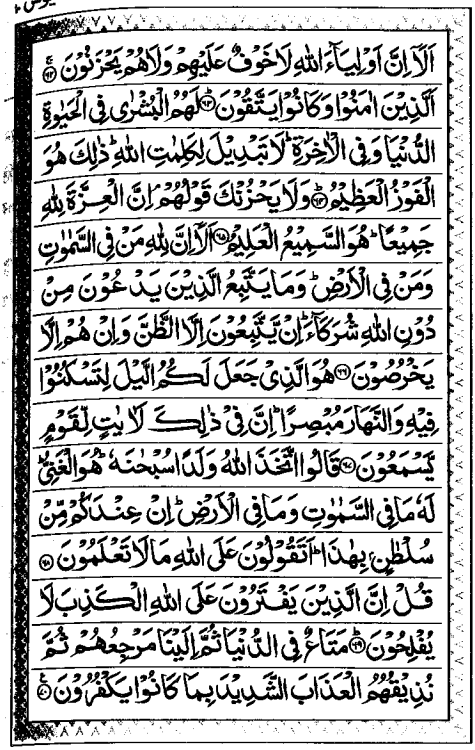

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ
ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ
ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ
جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ
وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن
دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟
فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱلْغَنِىُّ
لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن
سُلْطَـٰنٍۭ بِهَـٰذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾
قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَـٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ
نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

(৬২) মনে রেখো, যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। (৬৩) যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে—(৬৪) তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহ্‌র কথার কখনো হের-ফের হয় না। এটাই হল মহা সফলতা। (৬৫) আর তাদের কথায় দুঃখ নিয়ো না। আসলে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্‌র। তিনিই শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। (৬৬) শুনছ, আসমানসমূহে ও যমীনে যাকিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্‌র। আর এরা যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শরীকদের উপাসনার পেছনে পড়ে আছে—তা আসলে কিছুই নয়। এরা নিজেরই কল্পনার পেছনে পড়ে রয়েছে এবং এছাড়া আর কিছু নয় যে, এরা বুদ্ধি খাটাচ্ছে। (৬৭) তিনি তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন রাত, যাতে করে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পার, আর দিন দিয়েছেন দর্শন করার জন্য। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের জন্য যারা শ্রবণ করে। (৬৮) তারা বলে, আল্লাহ্ পুত্র সাব্যস্ত করে নিয়েছেন—তিনি পবিত্র, তিনি অমুখাপেক্ষী। যাকিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই তাঁর। তোমাদের কাছে তার কোন সনদ নেই। কেন তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ কর—যার কোন সনদই তোমাদের কাছে নেই? (৬৯) বলে দাও, যারা এরূপ করে তারা অব্যাহতি পায় না। (৭০) পার্থিবজীবনে সামান্যই লাভ, অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন আযাব—তাদেরই কৃত কুফরীর বদলাতে।

এমনিভাবে হযরত ওয়াসেলাহ্ ইবনে আশকা' (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে জানালো যে, আমার গলায় কষ্ট হচ্ছে। তিনি তাকেও একথাই বললেন যে, কোরআন পড়তে থাক।

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

অর্থাৎ, মানুষের কর্তব্য হল আল্লাহ্ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহকেই প্রকৃত আনন্দের বিষয় মনে করা এবং একমাত্র তাতেই আনন্দিত হওয়া। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও মান-সম্ভ্রম কোনটাই প্রকৃতপক্ষে আনন্দের বিষয় নয়। কারণ, একে তো কেউ যত অধিক পরিমাণেই তা অর্জন করুক না কেন, (সবই) অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে; পরিপূর্ণ হয় না। দ্বিতীয়তঃ সততই তার পতনাশঙ্কা লেগে থাকে। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে — هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র করুণা-অনুগ্রহ সে সমস্ত ধন-সম্পদও সম্মান-সাম্রাজ্য অপেক্ষা উত্তম, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের সমগ্র জীবনের ভরসা বিবেচনা করে সংগ্রহ করে।

এ আয়াতে দু'টি বিষয়কে আনন্দ-হরষের উপকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হল فضل 'ফজল', অপরটি رحمة 'রহমত'। এতদুভয়ের মর্ম কি? এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র 'ফজল'-এর মর্ম হল কোরআন, আর রহমত-এর মর্ম হল এই যে, তোমাদেরকে তিনি কোরআন অধ্যয়ন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করেছেন।— (রূহুল-মা'আনী, ইবনে মারদুবিয়াহ থেকে)

এ বিষয়টি হযরত বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া অনেক তফসীরকার মনীষী বলেছেন যে, 'ফযল' অর্থ কোরআন; আর রহমত হল ইসলাম। বস্তুতঃ এর মর্মার্থও তাই যা উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা বোঝা যায় যে, রহমতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদিগকে কোরআনের শিক্ষা দান করেছেন এবং এর উপর আমল করার সামর্থ্য দিয়েছেন। কারণ, ইসলামও এ তথ্যেরই শিরোনাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র ওলীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রশংসা ও পরিচয় বর্ণনার সাথে সাথে তাদের প্রতি আখেরাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—যারা আল্লাহ্‌র ওলী তাদের না থাকবে কোন অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোন উদ্দেশে ব্যর্থতার গ্লানি। আর আল্লাহ্‌র ওলী হলেন সে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করেছে। এদের জন্য পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং আখেরাতেও।

এতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। (এক) আল্লাহ্‌র ওলীগণের উপর ভয় ও শঙ্কা না থাকার অর্থ কি? (দুই) ওলীআল্লাহ্‌র সংজ্ঞা ও লক্ষণ কি? (তিন) দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁদের জন্য সুসংবাদের মর্ম কি?

প্রথম বিষয় 'আল্লাহ্‌র ওলীদের কোন ভয়-শঙ্কা থাকে না' অর্থ এও হতে পারে যে, আখেরাতের হিসাব-নিকাশের পর যখন তাঁদেরকে তাঁদের মর্যাদায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তখন ভয় ও আশঙ্কা থেকে চিরতরে তাঁদের মুক্ত করে দেয়া হবে। না থাকবে কোন রকম কষ্ট ও অস্থিরতার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোন প্রিয় ও কাঙ্খিত বস্তুর হাতছাড়া হয়ে যাবার দুঃখ। বরং তাদের প্রতি জান্নাতের নেয়ামতরাজি হবে চিরস্থায়ী,

অনন্ত। এ অর্থে আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা আপত্তির কারণই নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন অবশ্যই সৃষ্টি হয় যে, এতে শুধু ওলীগণের কোন বিশেষত্ব নেই, সমস্ত জান্নাতবাসী যারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তাদের সবাই এ অবস্থায়ই থাকবে। তবে একথা বলা যায় যে, যারা শেষ পর্যন্ত জান্নাতে পৌঁছবে তাদের সবাইকে ওলিআল্লাহ্ বলা হবে। পৃথিবীতে তাদের কার্যকলাপ যেমনই থাকুক না কেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর সবাই ওলীআল্লাহ্র তালিকায় গণ্য হবে।

কিন্তু অনেক তফসীরকার বলেছেন, ওলীআল্লাদের জন্য দুঃখ-ভয় না থাকা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। আর ওলিআল্লাহ্দের বৈশিষ্ট্যও তাই যে, পৃথিবীতেও তারা দুঃখ ভয় থেকে মুক্ত। এছাড়া আখেরাতে তাদের মনে কোন চিন্তা-ভাবনা না থাকা তো সবারই জানা। এতে সমস্ত জান্নাতবাসীই অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এতে অবস্থা ও বাস্তবতার দিক দিয়ে প্রশ্ন হল এই যে, পৃথিবীতে তো এ বিষয়টি বাস্তবতার পরিপন্থী দেখা যায়। কারণ, ওলীআল্লাহ্র তো কথাই নাই স্বয়ং নবী-রসূলগণও এ পৃথিবীতে ভয় ও আশঙ্কা থেকে মুক্ত নন বা ছিলেন না বরং তাঁদের ভয়-ভীতি অন্যান্যদের তুলনায় বেশীই ছিল। যেমন, কোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ, ওলামাগণই পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্কে ভয় করেন। অন্যত্র ওলিআল্লাহ্গণের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে مُّشْفِقُونَ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ অর্থাৎ, এরা সর্বক্ষণ আল্লাহ্র আযাবের ভয় করে। কারণ, তাদের পালনকর্তার আযাব এমন বিষয় যার সম্পর্কে কেউ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

আর ঘটনাপ্রবাহও তাই। যেমন, শামায়েলে-তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে অধিকাংশ সময় বিষণ্ন-চিন্তান্বিত দেখা যেত। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি আল্লাহ্কে তোমাদের সবার চেয়ে বেশী ভয় করি।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারুক (রাঃ) সহ অন্যান্য সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ীন ও ওলীআল্লাহ্গণের কাঁদা-কাটার ঘটনাবলী ও আখেরাতের ভয়-ভীতি-সন্তস্ত থাকার অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে।

তাই রূহুল মা'আনীতে আল্লামা আলুসী (রহঃ) বলেছেন, পার্থিব জীবনে ওলীআল্লাহ্গণের ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকা হল এ হিসেবে যে, পৃথিবীবাসী সাধারণতঃ যেসব ভয় ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন পার্থিব উদ্দেশ ও লক্ষ্য, আরাম-আয়েশ, মান-সম্ভ্রম ও ধন-সম্পদের সামান্য ক্ষতিতেই যে তারা মুচড়ে পড়ে এবং সামান্য কষ্ট ও অস্থিরতার ভয়ে তা থেকে বাঁচার তদবীরে রাত-দিন মজে থাকে। আল্লাহ্র ওলীগণের স্থান হয়ে থাকে এ সবের বহু উর্ধ্বে। তাঁদের দৃষ্টিতে না পার্থিব ক্ষণস্থায়ী মান-সম্ভ্রম ও আরাম-আয়েশের কোন গুরুত্ব আছে যা অর্জন করার জন্য সদা পরিব্যস্ত থাকতে হবে, আর না এখানকার দুঃখ-কষ্ট-পরিশ্রম কোন লক্ষ্য করার মত বিষয় যা প্রতিরোধ করতে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি আল্লাহ্র ওলীগণের সংজ্ঞা ও তাঁদের লক্ষণ সংক্রান্ত। 'আওলিয়া' শব্দটি ওলী শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় 'ওলী' অর্থ নিকটবর্তীও হয় এবং দোস্ত-বন্ধুও হয়। আল্লাহ্ তাআলার প্রেম ও নৈকট্যের একটি সাধারণ স্তর এমন রয়েছে যে, তার আওতা থেকে পৃথিবীর কোন মানুষ, কোন জীবজন্তু এমনকি কোন বস্তু-সামগ্রীই বাদ পড়ে না। যদি এ নৈকট্য না থাকে, তবে সমগ্র বিশ্বের কোন একটি বস্তুর অস্তিত্ব লাভ করতে পারত না। সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্বের প্রকৃত উপকরণ হল সেই সংযোগ যা আল্লাহ্ তাআলার সাথে রয়েছে। যদিও এ সংযোগের তাৎপর্য কেউ বুঝেনি বা বুঝতে পারেও না, তথাপি এ অশরীরী সংযোগ অপরিহার্য ও নিশ্চিত। কিন্তু 'আওলিয়া' শব্দের নৈকট্যের ঐ স্তরের কথা বলা উদ্দেশ নয়। বরং নৈকট্য, প্রেম ও ওলিত্বের দ্বিতীয় আরেকটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে যা আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ বিশেষ বন্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। সে নৈকট্যকে মুহাব্বত বা প্রেম বলা হয়। যারা নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হন, তাদেরকেই বলা হয় ওলীআল্লাহ্ তথা, আল্লাহ্র ওলী। যেমন এক হাদীসে-কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ "আমার বন্দা নফল এবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি নিজেও তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, সে যা কিছু শোনে, আমার মাধ্যমেই শোনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা কিছু সে দেখে, আমার মাধ্যমেই দেখে। আমিই তার হাত-পা হয়ে যাই, যা কিছু সে করে আমার দ্বারাই করে।" এর মর্ম হল এই যে, তার কোন গতি-স্থিতি ও অন্য যে কোন কাজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয় না।

বস্তুতঃ এই বিশেষ ওলীত্ব বা নৈকট্যের স্তর অগণিত ও অশেষ। এর সর্বোচ্চ স্তর নবী-রসূলগণের প্রাপ্য। কারণ, প্রত্যেক নবীরই ওলী হওয়া অপরিহার্য। আর এর সর্বোচ্চ—স্তর হল সায়্যেদুল আম্বিয়া নবী করীম (সাঃ)-এর এবং এ বেলায়েতের সর্বনিম্ন স্তর হল সুফী সাধকগণের পরিভাষায় 'দরজায়ে ফানা' তথা আত্মা বিলুপ্তির স্তর বলা হয়। এর মর্ম হল এই যে, মানুষের অন্তরাত্মা আল্লাহ্র স্মরণে এমনভাবে ডুবে যায় যে, পৃথিবীতে কারো মায়া-ভালবাসাই এর উপর প্রবল হতে পারে না। সে যাকে ভালবাসে, আল্লাহ্র জন্য ভালবাসে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তাও আল্লাহ্র জন্য করে। এক কথায় তার প্রেম ও ঘৃণা, ভালবাসা ও শত্রুতা কোনটাই নিজের ব্যক্তিগত কোন কারণে হয় না। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল যে তাঁর দেহ মন, ভেতর বাহির সবই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অন্বেষায় নিয়োজিত থাকে। তখন সে প্রত্যেক এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা আল্লাহ্ তাআলার কাছে পছন্দ নয়। এ অবস্থার লক্ষণই হল যিকরের আধিক্য ও আনুগত্যের সার্বক্ষণিকতা। অর্থাৎ, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করা এবং সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় তাঁর হুকুম আহকামের অনুগত থাকা। এ দু'টি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাঁকেই, ওলী বলা হয়। যার মধ্যে এ দু'টির কোন একটিও না থাকে সে এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এ দু'টিই উপস্থিত থাকে তার স্তরের নিম্নতা উচ্চতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এ সব স্তরের দিক দিয়েই ওলিআল্লাহ্গণের-মর্যাদায় বেশ কম হয়ে থাকে।

এক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, এ আয়াতে 'আওলিয়াল্লাহ' (আল্লাহ্র ওলীগণ) বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, সে সমস্ত লোককে যারা একান্তভাবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা পোষণ করে, কোন পার্থিব উদ্দেশ এর মাঝে থাকে না। (ইবনে মারদুবিয়্যাহ থেকে-মাযহারী) আর একথা সুস্পষ্ট যে, এ অবস্থা সে সমস্ত লোকেরই হতে পারে যাদের কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, বেলায়েতের এ স্তর লাভের উপায় কি?

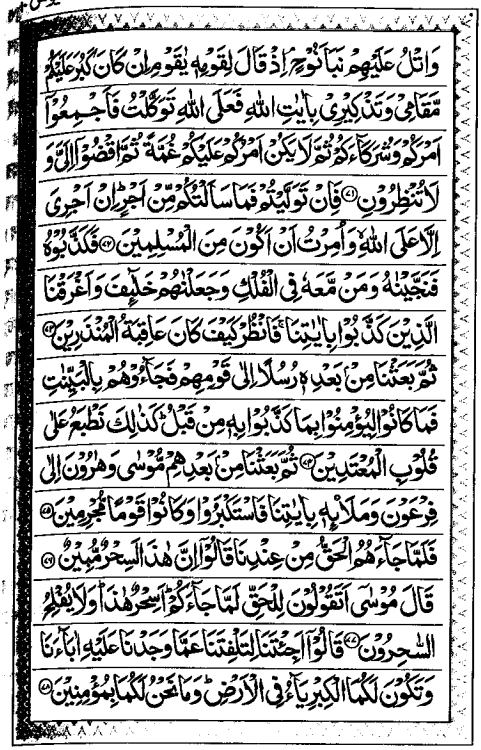

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ
مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا
أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ
لَا تُنْظِرُونِ ﴿٧١﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ
فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى
قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧٦﴾
قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ
السَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

(৭১) আর তাদেরকে শুনিয়ে দাও নূহের অবস্থা—যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহ্র আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের কর্ম সাব্যস্ত কর এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকে সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যাকিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না। (৭২) তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন কর, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় হল আল্লাহ্র দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আনুগত্য অবলম্বন করি। (৭৩) তারপরও এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। সুতরাং তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে বাঁচিয়ে নিয়েছি এবং যথাস্থানে আবাদ করেছি। আর তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি যারা আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন পরিণতি ঘটেছে তাদের যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। (৭৪) অনন্তর আমি নূহের পরে বহু নবী—রসূল পাঠিয়েছি তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি। তারপর তাদের কাছে তারা প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছে, কিন্তু তাদের দ্বারা এমনটি হয়নি যে, ঈমান আনবে সে ব্যাপারে, যাকে তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এভাবেই আমি মোহর এঁটে দেই সীমালংঘনকারীদের অন্তরসমূহের উপর। (৭৫) অতঃপর তাদের পেছনে পাঠিয়েছি আমি মূসা ও হারুনকে ফেরাউন ও তার সর্দারের প্রতি স্বীয় নির্দেশাবলী সহকারে। অথচ তারা অহংকার করতে আরম্ভ করেছে। (৭৬) বস্তুতঃ তারা ছিল গোনাহগার। তারপর আমার পক্ষ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য বিষয় উপস্থিত হল, তখন বলতে লাগলো, এগুলো তো প্রকাশ্য যাদু। (৭৭) মূসা বলল, সত্যের ব্যাপারে একথা বলছ, তা তোমাদের কাছে পৌছার পর? এ কি যাদু? অথচ যারা যাদুকর, তারা সফল হতে পারে না। (৭৮) তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদেরকে? আর যাতে তোমরা দুইজন এদেশের সর্দারী পেয়ে যেতে পার? আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই মানব না।

হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে মাযহারীতে বলেছেন, উম্মতের লোকদের এই স্তর রসূলে করীম (সাঃ)-এরই সংসর্গের মাধ্যমে লাভ হতে পারে। এভাবেই আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কের সে রূপ যা মহানবী (সাঃ) পেয়েছিলেন, স্বীয় যোগ্যতা অনুপাতে তার অংশবিশেষ উম্মতের ওলীগণ পেয়ে থাকেন। বস্তুতঃ মহানবী (সাঃ)-এর সংসর্গের ফযীলত সাহাবায়ে-কেরাম পেয়েছিলেন সরাসরি। আর সে কারণেই তাদের বেলায়েতের দরজা উম্মতের সমস্ত ওলী-কুতুব অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে। পরবর্তী লোকেরা এ ফযীলতই এক বা একাধিক মাধ্যমে অর্জন করেন। মাধ্যম যত বাড়তে থাকে ব্যবধানও সে পরিমাণেই বাড়তে থাকে। এই মাধ্যম শুধুমাত্র সে সমস্ত লোকই হতে পারেন, যারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর রঙে রঞ্জিত হতে পেরেছেন, তাঁর সুন্নতের হুবহু অনুসরণ করেছেন। এ ধরনের লোকদের সান্নিধ্য ও সংসর্গের সাথে সাথে যখন তাদের নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ্র যিকরেও আধিক্য ঘটে তখনই তা লাভ হয়। বেলায়েতের স্তর প্রাপ্তির এটিই পন্থা যা তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। (১) কোন ওলীর সংসর্গ, (২) তাঁর আনুগত্য ও (৩) আল্লাহ্র অধিক যিকর। কিন্তু শর্ত হল এই যে, এ যিকর সুন্নত তরীকা অনুযায়ী হতে হবে। কারণ, অধিক যিকরের দ্বারা যখন অন্তরের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সে নূর বেলায়েতের প্রতিফলনের যোগ্য হয়ে উঠে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর জন্য শিরিশ বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পন্থা রয়েছে, অন্তরের শিরিশ হল আল্লাহ্র যিকর। এ কথাই ইবনে-ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বায়হাকীও উদ্ধৃত করেছেন।

আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, (একবার) এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলনে, যে কোন বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে মুহাব্বত রাখে কিন্তু আমলের দিক দিয়ে তাঁর স্তরে পৌছাতে পারে না। হুযুর বললেন المرء مع من احب অর্থাৎ, প্রতিটি লোক তার সাথেই হবে যাকে সে ভালবাসে।' এতে প্রতীয়মান হয় যে, ওলিআল্লাহ্গণের সংসর্গ ও তাদের প্রতি মহব্বত রাখা মানুষের জন্য বেলায়েত বা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। ইমাম বায়হাকী 'শো'আবুল ঈমান' গ্রন্থে হযরত রাযীন (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত রাযীন (রাঃ)-কে বললেন যে, তোমাকে দ্বীনের এমন নীতিমালা বলে দিচ্ছি যাতে করে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও কৃতকার্যতা লাভ করতে পারবে—তা হল এই যে, যারা আল্লাহ্র স্মরণ করে তাদের মজলিস ও সংসর্গকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেবে এবং যখন একা থাকবে, তখন যত বেশী সম্ভব আল্লাহ্র যিকরে নিজের জিহবা নাড়তে থাকবে। যার সাথে মহব্বত রাখবে—আল্লাহ্র জন্য রাখবে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে, আল্লাহ্র জন্য করবে।— (মাযহারী)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ যে কাশ্ফ-কারামত ও গায়বী বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়াকে ওলীর লক্ষণ ধরে নিয়েছে, তা একান্ত ভুল ও ধোকা। হাজার হাজার ওলীআল্লাহ্ এমন ছিলেন এবং রয়েছেন যাদের দ্বারা এ ধরনের কোন বিষয় সংঘটিত হয়নি। পক্ষান্তরে এমন লোকের দ্বারাও কাশ্ফ ও গায়বী সংবাদ কথিত হয়েছে যার ঈমান পর্যন্ত ঠিক নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে হযরত মূসা ও হারূন (আঃ) এবং বনী-ইসরাঈল ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের কিছু অবস্থা এবং সে প্রসঙ্গে কিছু বিধি-বিধান আলোচনা করা

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ
قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ
مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾
فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ
وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ
لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ
فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ
لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ
آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

(৭৯) আর ফেরাউন বলল, আমার কাছে নিয়ে এস সুদক্ষ যাদুকরদিগকে। (৮০) তারপর যখন যাদকুররা এল, মূসা তাদেরকে বলল, নিক্ষেপ কর, তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করে থাক। (৮১) অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বলল, যাকিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ্ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দুষ্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। (৮২) আল্লাহ্ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়। (৮৩) আর কেউ ঈমান আনল না মূসার প্রতি তাঁর কওমের কতিপয় বালক ছাড়া—ফেরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়। ফেরাউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল। (৮৪) আর মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহ্র উপর ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর ভরসা কর যদি তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাক। (৮৫) তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর এ জালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করিও না। (৮৬) আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে ছাড়িয়ে দাও এই কাফেরদের কবল থেকে। (৮৭) আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে এবং নামায কায়েম কর আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর। (৮৮) মূসা বলল, হে আমার পরওয়ারদেগার, তুমি ফেরাউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ, এবং সম্পদ দান করেছ— হে আমার পরওয়ারদেগার, এ জন্যই যে তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করবে! হে আমার পরওয়ারদেগার, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়।

হয়েছে। প্রথম আয়াতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কিত হুকুম রয়েছে। তা'হল এই যে, বনী-ইসরাঈল যারা মূসা (আঃ)-এর দ্বীনের উপর আমল করত তাদের সবাই নিয়মিত নিজেদের নির্ধারিত উপসনালয়েই নামায আদায় করত। তাছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নির্দেশও ছিল তাই। তাদের নামায ঘরে পড়লে আদায় হতো না। তবে এই বিশেষ সুবিধা মহানবী (সাঃ)-এর উম্মতকেই দান করা হয়েছে যে, তারা যে কোনস্থানে ইচ্ছা নামায আদায় করে নিতে পারে। সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটিও উল্লেখ করেছেন যে, আমার জন্য গোটা যমীনকে মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে; সব জায়গাতেই নামায আদায় হয়ে যায়। তবে এটা আলাদা কথা যে, ফরয নামাযসমূহ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নতে মু'আক্কাদার সাব্যস্ত করা হয়েছে। নফল নামায ঘরে আদায় করা উত্তম। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-এরই উপর আমল করতেন। তিনি শুধু ফরয নামাযই মসজিদে পড়তেন। সুন্নত ও নফলসমূহ ঘরে গিয়ে আদায় করতেন। যাহোক, বনী-ইসরাঈলরা তাদের মাযহাব বা ধর্মমত অনুসারে নিজেদের উপাসনালয়ে গিয়ে নামায আদায়ে বাধ্য ছিল। এদিকে ফেরাউন যে, তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিত এবং তাদের উপর অত্যাচার করত, সে বিষয়টি লক্ষ্য করে তাদের সমস্ত উপসনালয় ভেঙ্গে চুরমার করে দিল; যাতে এরা নিজেদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নামায পড়তে না পারে। এরই কারণে আল্লাহ্ তাআলা বনী-ইসরাঈলের উভয় পয়গম্বর হযরত মূসা ও হারূন (আঃ)-কে নির্দেশ দান করলেন যা আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, মিসরে বনী-ইসরাঈলদের জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করা হোক যা কেবলামুখী হবে, যাতে করে তারা এসব আবাসিক ঘরেই নামায আদায় করতে পারে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এতে বোঝা যাচ্ছে, উম্মতের জন্য যদিও এ নির্দেশ ছিল যে, তাদেরকে শুধুমাত্র নির্ধারিত উপসনালয়েই নামায পড়তে হবে, কিন্তু এই বিশেষ বাধার পরিপ্রেক্ষিতে বনী ইসরাঈলদের জন্য নিজেদের ঘরে নামায আদায় করে নেয়ার সাময়িক অনুমতি দেয়া হয় এবং তাদের ঘরের দিক্ষা কেবলার দিকে সোজা করে নিতে বলা হয়। তাছাড়া এমনও বলা যেতে পারে, এই বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তাদেরকে নির্ধারিত সে ঘরে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছিল, যা কেবলামুখী করে নির্মাণ করা হয়েছিল। সাধারণ ঘরে কিংবা সাধারণ জায়গায় নামায পড়ার অনুমতি তখনও ছিল না, যেমনটি মহানবী (সাঃ)-এর উম্মতের জন্য রয়েছে যে, যে কোন শহরে কিংবা মাঠে যে কোন স্থানে নামায আদায় করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।— (রূহুল-মা'আনী)

এখানে এ প্রশ্নটি লক্ষ্য করার মত যে, এ আয়াতে বনী-ইসরাঈলদেরকে যে কেবলার প্রতি মুখ করার হুকুম দেয়া হয়েছে তা কোন কেবলা ছিল—কা'বা ছিল না বায়তুল মুকাদ্দাস? হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এতে কা'বাই উদ্দেশ্য এবং কা'বাই ছিল হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর আস্হাবের কেবলা। — (কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী) বরং কোন কোন ওলামা এমনও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রসূলের কেবলাই ছিল কা'বা শরীফ।

আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা নিজেদের নামাযে 'সাখরায় বায়তুল মুকাদ্দাসে'র দিকে মুখ করত, তাকে সে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যখন হযরত মূসা (আঃ) মিসর ছেড়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। এটা মিসরে অবস্থানকালে তাঁর কেবলা বায়তুল্লাহ্ হওয়ার পরিপন্থী নয়।

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ
فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ
آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَ
أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ
آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَقَدْ
بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ
مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن
قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾

(৮৯) বললেন, তোমাদের দোয়া মঞ্জুর হয়েছে। অতএব, তোমরা দু' জন অটল থাক এবং তাদের পথে চলো না যারা অজ্ঞ। (৯০) আর বনী-ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মা'বুদ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী-ইসরাঈলরা। বস্তুতঃ আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। (৯১) এখন একথা বলছ। অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করছিলে। এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (৯২) অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না। (৯৩) আর আমি বনী-ইসরাঈলদিগকে দান করেছি উত্তম স্থান এবং তাদেরকে আহার্য দিয়েছি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বস্তু-সামগ্রী। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়নি যতক্ষণ না তাদের কাছে এসে পৌছেছে সংবাদ। নিঃসন্দেহে তোমার পরওয়ারদেগার তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন কিয়ামতের দিন ; যে ব্যাপারে তাদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছিল। (৯৪) সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না। (৯৫) এবং তাদের অন্তর্ভুক্তও হয়ো না যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহ্‌র বাণীকে। তাহলে তুমিও অকল্যাণে পতিত হয়ে যাবে (৯৬) যাদের ব্যাপারে তোমার পরওয়ারদেগারের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়ে গেছে তারা ঈমান আনবে না। (৯৭) যদি তাদের সামনে সমস্ত নিদর্শনাবলী এসে উপস্থিত হয় তবুও যতক্ষণ না তারা দেখতে পায় বেদনাদায়ক আজাব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ ৮৯নং আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, নামায পড়ার জন্য কেবলামুখী হওয়ার শর্তটি পূর্ববর্তী নবীগণের সময়েও বিদ্যমান ছিল। তেমনিভাবে পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রসূলের শরীয়তই নামাজের জন্য পবিত্রতা ও আবরু ঢাকা যে শর্ত ছিল, তাও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদটি উভয় পয়গম্বরকেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁদেরকে সামান্য পরীক্ষা করা হয়েছে যে, দোয়া কবুল হওয়ার লক্ষণ আল্লামা বগভীর মতে চল্লিশ বছর পর প্রকাশিত হয়। সে কারণেই এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করার সাথে সাথে উভয় নবীকে এ হেদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ, নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব দাওয়াত ও তবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকুন, দোয়া কবুল হওয়ার প্রতিক্রিয়া যদি দেরীতেও প্রকাশ পায়, তবুও জাহেলদের মত তাড়াহুড়া করবেন না।

৯০ নং আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর বিখ্যাত মু'জেযা সাগর পাড়ি দেয়া এবং ফেরাউনের ডুবে মরার বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ, যখন তাকে জলডুবিতে পেয়ে বসল তখন বলে উঠল, আমি ঈমান এনেছি যে, যে আল্লাহ্‌র উপর বনী-ইসরাঈলরা ঈমান এনেছে তাঁকে ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর আমি তাঁরই আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে তার উত্তর দেয়া হয়েছে آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ অর্থাৎ, কি এতক্ষণে ঈমান এনেছ? অথচ ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মৃত্যুকালে ঈমান আনা শরীয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টির আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসের দ্বারাও হয়, যাতে মহানবী (সাঃ) বলেছেন— আল্লাহ্ তাআলা বন্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্তই কবুল করতে থাকেন যতক্ষণ না মৃত্যুর ঊর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়।— (তিরমিযী)

মৃত্যুকালীন ঊর্ধ্বশ্বাস বলতে সে সময়কে বোঝানো হয়েছে, যখন জান কবজ করার সময় ফেরেশতা সামনে এসে উপস্থিত হন। তখন কর্মজগত পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত হয়ে আখেরাতের হুকুম-আহকাম আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই সে সময়কার কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমানও নয় এবং কুফরও নয়। এমন সময়ে যে লোক ঈমান গ্রহণ করে,তাকেও মুমিন বলা যাবে না এবং কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, ফেরাউনের এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঐকমত্যে ফেরাউনের মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে। তাছাড়া কোরআনের প্রকৃষ্ট নির্দেশেও এটাই সুস্পষ্ট। তাই যারা ফেরাউনের এই ঈমানকে গ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন, হয় তার কোন ব্যাখ্যা করতে হবে, না হয় তাকে ভুল বলতে হবে।— (রূহুল-মা'আনী)

এমনিভাবে খোদানাখাস্তা এমনি মুমূর্ষু অবস্থায় যদি কারো মুখ দিয়ে কুফরী বাক্য বেরিয়ে যায়, তবে তাকে কাফেরও বলা যাবে না। বরং তার জানাযার নামায পড়ে তাকে মুসলমানদের মত দাফন করতে হবে এবং তার সে কুফরী বাক্যের রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন, কোন কোন ওলী আল্লাহ্‌র অবস্থার দ্বারাও তার সমর্থন পাওয়া যায় যে, এমন বাক্য তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানুষ যাকে কুফরী বাক্য মনে করে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে যখন তাঁর কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে আসে এবং সে বাক্যে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে দেন, তখন সবাই নিশ্চিন্ত হয় যে, তা সাক্ষাৎ ঈমানী বাক্যই ছিল।

সারকথা এই যে, যখন রূহ বেরোতে থাকে এবং অন্তিম অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন সে সময়টি পার্থিবজীবনে গণ্য হয় না। তখনকার কোন আমল বা কার্যকলাপ শরীয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এর পূর্বেকার যাবতীয় আমলই ধর্তব্য হয়ে থাকে। কিন্তু উপস্থিত দর্শকদের এ ব্যাপারে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কারণ, এ বিষয়টির সঠিক অনুমান করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হতে পারে যে, বাস্তবিকই এ সময়টি রূহ বেরোবার কিংবা ঊর্ধ্বশ্বাসের সময় কি তার পূর্ব মুহূর্ত।

এখানে ফেরাউনকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, জলমগ্নতার পর আমি তোমার লাশ পানি থেকে বের করে দেব যাতে তোমার এই মৃতদেহটি তোমার পরবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ্ তাআলার মহাশক্তির নিদর্শন ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।

ঘটনাটি এই যে, সাগর পাড়ি দেবার পর হযরত মূসা (আঃ) যখন বনী-ইসরাঈলদেরকে ফেরাউনের নিহত হবার সংবাদ দেন, তখন তারা ফেরাউনের ব্যাপারে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল যে, তা অস্বীকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, ফেরাউন ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সঠিক ব্যাপার প্রদর্শন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশে একটি ঢেউয়ের মাধ্যমে ফেরাউনের মৃতদেহটি তীরে এনে ফেলে রাখলেন, যা সবাই প্রত্যক্ষ করল। তাতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এল এবং তার এ লাশ সবার জন্য নিদর্শন হয়ে রইল। তারপর এ লাশের কি পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় না। যেখানে ফেরাউনের লাশটি পাওয়া গিয়েছিল আজও সে স্থানটি 'জাবালে ফেরাউন' নামে পরিচিত।

কিছুকাল পূর্বে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, ফেরাউনের লাশ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, সাধারণ লোকেরাও তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং আজ পর্যন্ত তা কায়রোর যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এ ফেরাউনই সে ফেরাউন, যার সাথে হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলা হয়েছিল, নাকি অন্য কোনও ফেরাউন। কারণ, ফেরাউন শব্দটি কোন একক ব্যক্তির নাম নয়; সে যুগে মিসরের সব বাদশাহ্‌কেই ফেরাউন পদবী দেয়া হত।

কিন্তু এটাও কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে জলমগ্ন লাশকে শিক্ষামূলক নিদর্শন হিসাবে সাগর তীরে এনে ফেলেছিলেন, তেমনিভাবে সেটিকে আগত বংশধরদের শিক্ষার জন্য পচাগলা থেকেও রক্ষা করে থাকবেন এবং এখনো তা বিদ্যমান থাকবে।

পরবর্তী আয়াতে ফেরাউনের করুণ পরিণতির মোকাবেলায় সে জাতির ভবিষ্যৎ দেখানো হয়েছে, যাদেরকে ফেরাউন হীন ও পদদলিত করে রেখেছিল। বলা হয়েছে, আমি বনী-ইসরাঈলকে উত্তম আবাস দান করেছি। একদিকে তারা মিসর রাষ্ট্রের আধিপত্য লাভ করেছে এবং অপরদিকে জর্দান ও ফিলিস্তীনের পবিত্র ভূমিও তারা পেয়ে গেছে যাকে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় খলীল ইবরাহীম ও তাঁর সন্তানবর্গের জন্য চিরস্থায়ী বানিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তম আবাসকে কোরআন করীমে مُبَوَّاَ صِدْقٍ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে صِدْقٍ অর্থ কল্যাণজনক ও উপযোগী। অর্থাৎ, এমন আবাসভূমি তাদেরকে দান করা হয়েছে যা তাদের জন্য সর্বদিক দিয়েই কল্যাণকর ও উপযোগী ছিল। অতঃপর বলা হয়েছে— আমি তাদেরকে হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রীর মাধ্যমে আহার্য দান করেছি। অর্থাৎ, দুনিয়ার যাবতীয় সুস্বাদু বস্তু-সামগ্রী ও আরাম-আয়েশ তাদের দিয়ে দিয়েছি।

আয়াতের শেষাংশে আবার তাদের কুটিলতা ও ভ্রান্ত আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যেও বহু লোক ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতসমূহের মর্যাদা দেয়নি এবং তাঁর আনুগত্যে বিমুখতা অবলম্বন করেছে। এরা রসূলে করীম (সাঃ) সম্পর্কে তওরাতে যেসব নিদর্শন পাঠ করত, তাতে তাঁর আগমনের সর্বাগ্রে তাদেরই ঈমান আনা উচিত ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তো এরা শেষ নবীর উপর বিশ্বাস পোষণ করত, তার নিদর্শনসমূহ ও তাঁর আগমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ লোকদেরকে বলত, নিজেরাও দোয়া করতে গিয়ে শেষ যমানার নবীর ওসীলা দিয়ে দোয়া করত, কিন্তু যখন শেষ যমানার নবী (সাঃ) তাঁর যাবতীয় প্রমাণাদি এবং তওরাতের বাতলানো নিদর্শনসহ আগমন করলেন, তখন এরা পারস্পরিক মতবিরোধ করতে লাগল এবং কিছু লোক ঈমান আনলেও অন্যান্য সবাই অস্বীকার করল। এ আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর আগমনকে جَآءَهُمُ الْعِلْمُ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে علم বলতে 'নিশ্চিত বিশ্বাস'ও উদ্দেশ্য হতে পারে। তাহলে অর্থ হবে এই যে, যখন প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে বিশ্বাসের উপকরণসমূহও সংযোজিত হয়ে গেল, তখন তারা মতবিরোধ করতে লাগল।

কোন কোন তফসীরবিদ একথাও বলেছেন যে, এখানে علم অর্থ معلوم অর্থাৎ, যখন সে সত্তা সামনে এসে উপস্থিত হল, যা তওরাতে ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই জানা ছিল, তখন তারা মতবিরোধ করতে আরম্ভ করল।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۭ لَمَّآ
اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ
اِلٰى حِيْنٍ ۝ وَلَوْ شَاۗءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۭ
اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ
اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِيْنَ لَا
يَعْقِلُوْنَ ۝ قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَا تُغْنِي
الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا
مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ قُلْ فَانْتَظِرُوْا ۭ اِنِّىْ مَعَكُمْ
مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝ ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ
حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ
شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۠ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا
يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৯৮) সুতরাং কোন জনপদ কেন এমন হল না যা ঈমান এনেছে অতঃপর যার সে ঈমান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর? অবশ্য ইউনুসের সম্প্রদায়ের কথা আলাদা। তারা যখন ঈমান আনে, তখন আমি তুলে নেই তাদের উপর থেকে অপমানজনক আযাব–পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌঁছাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। (৯৯) আর তোমার পরওয়ারদেগার যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই ঈমান নিয়ে আসতে সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তী করবে ঈমান আনার জন্য? (১০০) আর কারো ঈমান আনা হতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র হুকুম হয়। পক্ষান্তরে তিনি অপবিত্রতা আরোপ করেন যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে না তাদের উপর। (১০১) তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ যা আসমানসমূহে ও যমীনে কি রয়েছে। আর কোন নিদর্শন এবং কোন ভীতিপ্রদর্শনই কোন কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য যারা মান্য করে না। (১০২) সুতরাং এখন আর এমন কিছু নেই, যার অপেক্ষা করবে, কিন্তু সেসব দিনের মতই দিন, যা অতীত হয়ে গেছে এর পূর্বে। আপনি বলুন, এখন পথ দেখ ; আমিও তোমাদের সাথে পথ চেয়ে রইলাম। (১০৩) অতঃপর আমি বাঁচিয়ে নেই নিজের রসূলগণকে এবং তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এমনিভাবে। ঈমানদারদের বাঁচিয়ে নেয়া আমার দায়িত্বও বটে। (১০৪) বলে দাও– হে মানবকুল, তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে থাক, তবে (জেনো) আমি তাদের এবাদত করি না যাদের এবাদত তোমরা কর আল্লাহ্ ব্যতীত। কিন্তু আমি এবাদত করি আল্লাহ্ তাআলার যিনি তুলে নেন তোমাদেরকে। আর আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে যাতে আমি ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। (১০৫) আর যেন সোজা দ্বীনের প্রতি মুখ করি সরল হয়ে এবং যেন মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত না হই। (১০৬) আর নির্দেশ হয়েছে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভাল করবে না মন্দও করবে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ কর, তাহলে তখন তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এক্ষেত্রে সমকালীন কোন কোন লোকের কঠিন বিভ্রান্তি ঘটে গেছে। তারা হযরত ইউনুস (আঃ)–এর প্রতি রেসালতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যকে যুক্ত করে দেন এবং পয়গম্বরের শৈথিল্যতাকেই সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব সরে যাবার কারণ সাব্যস্ত করেন। তদুপরি এই শৈথিল্যতাকেই খোদায়ী রোষের কারণ বলে সাব্যস্ত করেন। সূরা–আম্বিয়া ও সূরা সাফফাতে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। তা এরূপ ঃ "কোরআনের ইঙ্গিত এবং ইউনুস (আঃ)–এর গ্রন্থের বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি পরিষ্কার জানা যায় যে, ইউনুস (আঃ)–এর দ্বারা রেসালতের দায়িত্ব পালনে যৎসামান্য ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল এবং হয়তো তিনি অধৈর্য হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেজন্য আযাবের লক্ষণাদি দেখেই যখন তাঁর সঙ্গী–সাথীগণ তওবা–এস্তেগফার আরম্ভ করে দেয়, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কোরআনে আল্লাহ্ তাআলার যেসব মূল রীতিনীতির কথা বলা হয়েছে, তাতে একটি নির্দিষ্ট ধারা এও রয়েছে যে, আল্লাহ্ কোন জাতি–সম্প্রদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত আযাবে লিপ্ত করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের উপর স্বীয় প্রমাণাদি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। সুতরাং নবীর দ্বারা যখন রেসালতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তিনি নিজেই যখন স্থান ত্যাগ করেন, তখন আল্লাহ্‌র ন্যায়নীতি তাঁর সম্প্রদায়কে সেজন্য আযাব দান করতে সম্মত হয়নি। — (তাফ্‌হীমুল–কোরআন ঃ মাওলানা মওদুদী পৃষ্ঠা ৩১২, জিলদ—২)

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পাপ থেকে মা'সুম হওয়ার বিষয়টি এমন একটি সর্বসম্মত বিশ্বাস, যার উপর সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য বিদ্যমান। এর বিশ্লেষণে কিছু আংশিক মতবিরোধও রয়েছে যে, এই নিষ্পাপত্ব কি সগীরা–কবীরা সর্বপ্রকার গোনাহ্ থেকেই, না শুধু কবীরা গোনাহ্ থেকে। তাছাড়া এ নিষ্পাপত্বে নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বেকার সময়ও অন্তর্ভুক্ত কি না? কিন্তু এতে কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কারোই কোন মতবিরোধ নেই যে, নবী–রসূলগণের কেউই রেসালতের দায়িত্ব পালনে কোন রকম শৈথিল্য করতে পারেন না। তার কারণ, নবী–রসূলগণের জন্য এর চাইতে বড় পাপ আর কিছুই হতে পারে না যে, যে দায়িত্বে আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে নির্বাচন করেছেন, তাঁরা নিজেই তাতে শৈথিল্য করে বসবেন। এটা সে মর্যাদাগত দায়িত্বের প্রকাশ্য খেয়ানত, যা সাধারণ শালীনতা–সম্পন্ন মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। এহেন ত্রুটি থেকেও যদি নবীগণ নির্দোষ না হবেন, তবে অন্যান্য পাপের বেলায় নিষ্পাপ হলেই বা কি লাভ।

কোরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত মূলনীতি ও নবীগণের নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে সর্বসম্মত বিশ্বাসের পরিপন্থী বাহ্যিক কোন কথা যদি কোরআন–হাদীসের মাঝেও কোনখানে দেখা যায়, তবে সর্বসম্মত মূলনীতির ভিত্তিতে তার এমন ব্যাখ্যা ও অর্থ অনুসন্ধান করা কর্তব্য ছিল, যাতে তা কোরআন–হাদীসের অকাট্য প্রামাণ্য মূলনীতির বিরোধী না হয়।

কিন্তু এখানে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, উল্লেখিত গ্রন্থকার মহোদয় যে বিষয়টি কোরআন করীম ও হযরত ইউনুস (আঃ)–এর সহীফার বিশ্লেষণের উদ্ধৃতিক্রমে উপস্থাপন করেছেন, তা সহীফায়ে–ইউনুসে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের নিকট তার কোন গুরুত্ব বা গ্রাহ্যতা নেই। তবে এ ব্যাপারে কোরআনী ইঙ্গিত একটিও নেই। বরং ব্যাপারটি হলো এই যে, কয়েকটি প্রেক্ষিত জড়ো করে তা থেকে এই

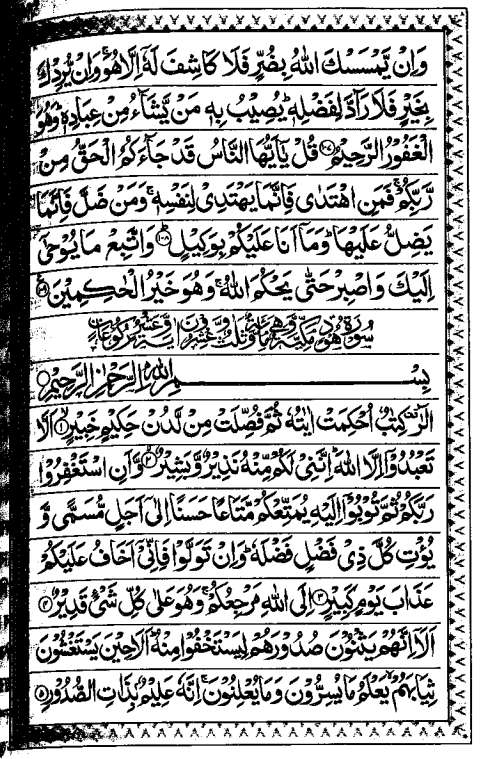

(১০৭) আর আল্লাহ্ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খণ্ডাবার মত তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুতঃ তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু। (১০৮) বলে দাও, হে মানবকুল, সত্য তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে। এমন যে কেউ পথে আসে সে পথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই। (১০৯) আর তুমি চল সে অনুযায়ী যেমন নির্দেশ আসে তোমার প্রতি এবং সবর কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেন আল্লাহ্। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

সূরা হূদ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ঃ ১২৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ, লা-ম, রা; এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত এক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে। (২) যেন তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাঁরই পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। (৩) আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশী করে দেবেন। আর যদি তোমরা বিমুখ হতে থাক, তবে আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি। (৪) আল্লাহ্র সান্নিধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৫) জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয় যেন আল্লাহ্র নিকট হতে লুকাতে পারে। শুন, তারা তখন কাপড়ে নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করে, তিনি তখনও জানেন যা কিছু তারা চুপিসারে বলে আর প্রকাশ্যভাবে বলে। নিশ্চয় তিনি জানেন যা কিছু অন্তরসমূহে নিহিত রয়েছে।

–"ইউনুস (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এজন্য চলে যাচ্ছিলেন যে, তিনি সম্প্রদায়ের কঠিন বিরোধিতা এবং কুফরীর উপর হঠকারিতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত রেসালতের আহবান জানাতে থাকার ফলাফল প্রত্যক্ষ করে নিয়েছিলেন।"

বস্তুতঃ তাঁর এ সফর ছিল হিজরত হিসাবেই। অথচ তখনও তিনি হিজরতের অনুমতি লাভ করেননি।

এতে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রতি ভর্ৎসনা আসার কারণ রেসালত ও দাওয়াতের দায়িত্বে শৈথিল্য প্রদর্শন ছিল না; বরং অনুমতির পূর্বে হিজরত করাই ছিল ভর্ৎসনার কারণ। উল্লেখিত সমকালীন তফসীরকারকে কোন কোন ওলামা তাঁর এই ভুলের ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি সূরা-সাফ্ফাতের তফসীরে স্বীয় মতবাদের সমর্থনে অনেক তফসীরবিদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ প্রমুখের ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ ছাড়া অন্য কোনটির দ্বারাই তাঁর এ মতবাদের সমর্থন প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ইউনুস (আঃ)–এর দ্বারা (মা'আযাল্লাহ্) রেসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল।

তাছাড়া জ্ঞানবান বিজ্ঞ লোকদের একথা অজানা নেই যে, তফসীরবিদগণ নিজেদের তফসীরে এমনসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহও উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তাদের সবাই একমত যে, এসব রেওয়ায়েত প্রামাণ্য কিংবা গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তের কোন হুকুমকে এগুলোর উপর নির্ভরশীল করা যায় না। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত মুসলিম তফসীরবিদদের গ্রন্থেই থাক বা ইউনুস (আঃ)–এর সহীফাতেই থাক, শুধু এসবের উপর নির্ভর করেই হযরত ইউনুস (আঃ)–এর উপর এহেন মহা অপবাদ আরোপ করা যেতে পারে না যে, তাঁর দ্বারা রেসালতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়েছে। ইসলামের কোন তফসীরকার এহেন কোন মত গ্রহণও করেননি।

সূরা হূদ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হূদ ঐসব সূরার অন্যতম যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আপতিত খোদায়ী গজব ও বিভিন্ন প্রকার কঠিন আযাবের এবং পরে কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশেষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদিন হযরত রসূলে করীম (সাঃ)–এর কিছু দাড়ি-মোবারক পাকা দেখে বিচলিত হয়ে যখন জিজ্ঞেস করলেন–"ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ); আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন।" তখন রসূলে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছিলেন, "হাঁ, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" তখন কোন কোন রেওয়ায়েতে সূরা হূদের সাথে সূরা ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসা'আলুন এবং সূরা তাকবীরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে।–(আল-হাকেম ও তিরমিযী শরীফ) উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সূরাগুলিতে বর্ণিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণে এসব সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলে পাক (সাঃ)–এর পবিত্র চেহারায় বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দেয়।

অত্র সূরার প্রথম আয়াত "আলিফ লা'ম রা" বলে শুরু করা হয়েছে। এগুলো সে সমস্ত বর্ণের অন্তর্ভুক্ত যার সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর

রসূল (সাঃ)–এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য। অন্য কাউকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি; বরং এ ব্যাপারে চিন্তা করতেও বারণ করা হয়েছে।

অতঃপর কোরআন মজীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। محكم শব্দ احكام হতে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে কোন বাক্যকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করা যার মধ্যে শব্দগত বা ভাবগত কোন বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। সেমতে আয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যাতে শাব্দিক অথবা ভাবগত দিক দিয়ে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি, অস্পষ্টতা বা অসারতার সম্ভাবনা নেই।—(তফসীরে–কুরতুবী)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন এখানে محكم শব্দ منسوخ –এর বিরপীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেমতে আয়াতের মর্ম হবে—আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকের আয়াতসমূহকে সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, অপরিবর্তিতরূপে তৈরী করেছেন। তওরাত, ইঞ্জীল, ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাসমূহ পবিত্র কোরআন নাযিলের ফলে যেভাবে 'মনসূখ'বা রহিত হয়েছে কোরআন পাক নাযিল হওয়ার পর যেহেতু নবীর আগমন এবং ওহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব আর রহিত হবে না।—(কুরতুবী) তবে কোরআনের এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াত রহিত হওয়া এর পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য ১ম আয়াতেই ثُمَّ فُصِّلَتْ অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বলে কোরআন পাকের আরেকটি মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। تفصيل শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'টি বস্তুর মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান করা। সে জন্যেই সাধারণ গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন বিষয়বস্তু فصل، فصل শিরোনামে আলোচনা করা হয়। সে হিসাবে অত্র আয়াতের মর্ম হবে, আকায়েদ, এবাদত, লেন–দেন আচার–ব্যবহার ও নীতি–নৈতিকতার বিষয়বস্তুগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর আরেক অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তো পূর্ণ কোরআন মজীদ একসাথে লওহে মাহফূযে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর স্থান–কাল–পাত্র, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর স্মরণ রাখা, মর্ম অনুধাবন করা এবং ক্রমানুয়ে তদনুযায়ী আমল করা সহজ হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ অর্থাৎ, এসব আয়াত এমন এক মহান সত্তার পক্ষ হতে আগত হয়েছে, যিনি মহা প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ, যার প্রতিটি কাজে বহু তাৎপর্য ও হেকমত বিদ্যমান—যা মানুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম। তিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি যাবতীয় বিধি–নিষেধ নাযিল করেন। মানুষ যতবড় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান ও দূরদর্শী হোক না কেন, তার জ্ঞান–বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা এক নির্দিষ্ট সীমারেখার গন্ডিতে আবদ্ধ। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ভিত্তিতে তাদের অভিজ্ঞতা গড়ে উঠে। ভবিষ্যৎকালে অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক সময়ই তা ব্যর্থ ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার এলম ও হেকমত কখনো ভুল হবার নয়।

দ্বিতীয় আয়াতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ, তওহীদের উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহের বর্ণনা আরম্ভ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ, "একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবে না।" আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ্ তা আলা ব্যতীত অন্য কারও এবাদত–উপাসনা করবে না।

অতঃপর এরশাদ করেছেন اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ 'নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। এ আয়াতে বিশ্বনবী (সাঃ)–কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি সারা বিশ্ববাসীকে যেন জানিয়ে দেন যে, আমি আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী। অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্য ও বিরুদ্ধাচরণকারী এবং নিজেদের অবৈধ কামনা–বাসনার অনুসারী, তাদেরকে আল্লাহ্র ভীতি প্রদর্শন করছি। অপরদিকে অনুগত, বাধ্যগত লোকদের দো–জাহানের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আখেরাতে অফুরন্ত নেয়ামতের সুসংবাদ দিচ্ছি।

نَذِيْرٌ শব্দের অর্থ করা হয়, "ভীতি প্রদর্শনকারী।" কিন্তু এ শব্দটি ভীতি প্রদর্শনকারী শত্রু কিংবা হিংস্রজন্তু বা অন্য কোন অনিষ্টকারীর জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং এমন ব্যক্তিকে "নাযীর" বলা হয় যিনি স্বীয় প্রিয়পাত্রগণকে সস্নেহে এমনসব বস্তু বা কার্য হতে বিরত রাখেন ও ভয় দেখান, যা তাদের জন্য দুনিয়া, আখেরাত অথবা উভয় কালেই ক্ষতিকারক।